



যুগের পর যুগ





মানুষ তখন কী ছেলেমানুষ!





দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



"যুগের পর যুগ" গ্রন্থমালা : ১

মানুষ তখন কী ছেলেমানুষ !

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

"যুগের পর যুগ" গ্রন্থমালার প্রথম ছটি বই

১। মানুষ তখন কী ছেলেমানুষ! (আদিম যুগ)

২। রেমি! রেমি! মানুষের নামকরণ (মিশর যুগ)

৩। হারাপ্পা চলো হারাপ্পা পেরিয়ে (প্রাক-ঐতিহাসিক ভারত)

৪। পাশা খেলা খেলা নয় (ভারতের বৈদিক যুগ)

৫। মানুষের হারজিত (গ্রীক যুগ—দাসপ্রথা)

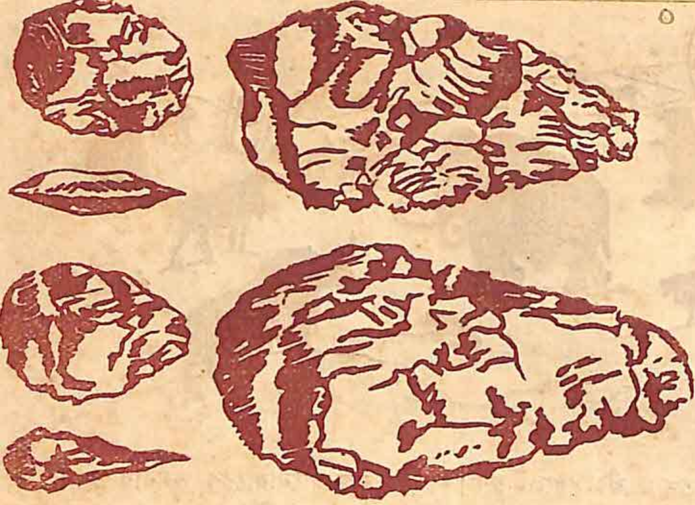
৬। তুমি যে পথেই এগোও না কেন (রোম সাম্রাজ্যের যুগ)

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৬০
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শ্রীকাতিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
খালেদ চৌধুরী
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

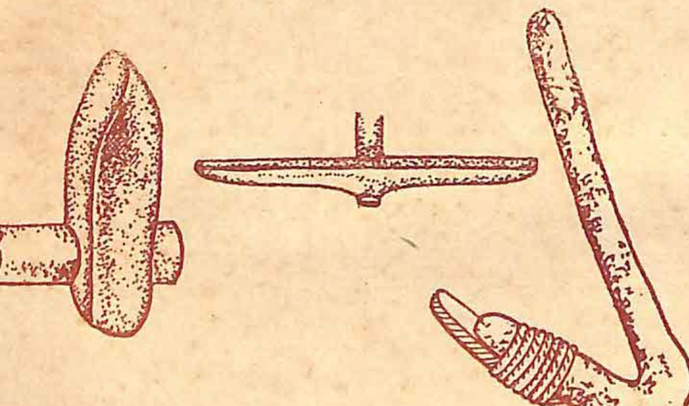
এক টাকা



মানুষ তখন কী ছেলেমানুষ! অন্য জন্তু-জানোয়ারের তুলনায় তখন বেচারার দশাটা দেখো না—ছবির মাথার দিকে, বাঁ-পাশের কোণায়, তাই এঁকে দেখানো হয়েছে। ২৫ পাতা দেখো



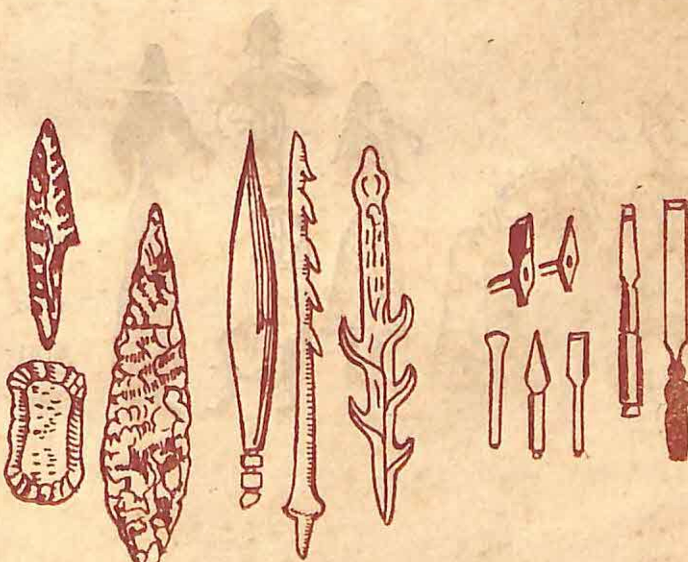
ভোরের পাথর। ১৮ পাতা দেখো



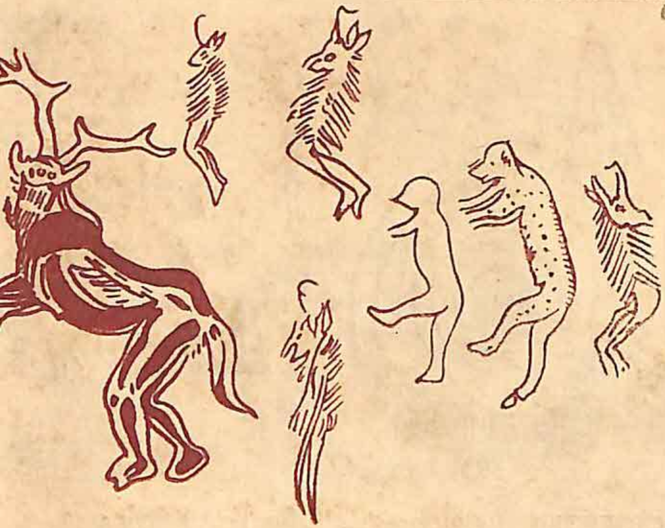
নতুন পাথর-যুগের হাতিয়ার। ৩৫ পাতা দেখো



ব্রোঞ্জ যুগের হাতিয়ার আর হাতের তৈরি জিনিস। ২৬ পাতা দেখো



পাথর যুগ থেকে লোহার যুগ। সবচেয়ে বাঁ-পাশে পাথর, মাঝখানে ব্রোঞ্জ আর ডানপাশে লোহার তৈরি হাতিয়ার। ২৪ পাতা দেখো



ছদ্মবেশী নাচ!
আ দি ম
মা নু ষে র ই
আঁকা ছবি।



আদিম মা নু ষে র
আঁকা আর এক
রকম নাচের ছবি।



ঢালের ওপর জানোয়ারের ছবি কেন? ৬২ পাতা দেখো



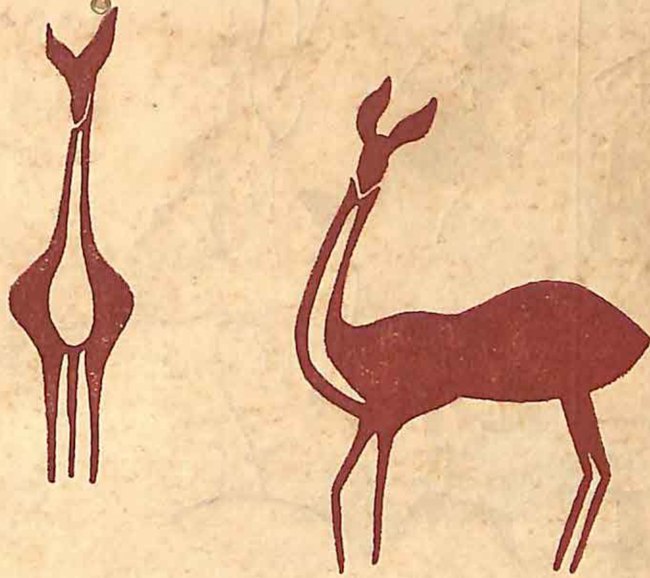
ইজিপ্ট আর ভারতের দেবদেবী। জন্তুজানোয়ারের মাথা কেন?
৬১ পাতা দেখো



আদিম মানুষের আঁকা ছবি। কিসের ছবি? ৬৪ পাতা দেখো



এ-ছবিরই বা উদ্দেশ্য কী? ৬৪ পাতা দেখো



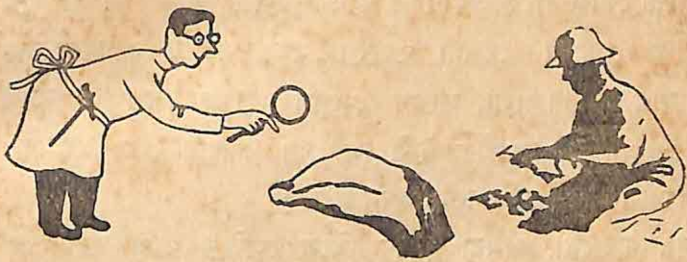
কী আশ্চর্য ছবি ! কিন্তু শুধুই মানুষের মন ভোলাবার জন্যে আঁকা নয়।



যুদ্ধে বেরুবার আগেই যুদ্ধের ছবি আঁকা কেন? ৬৫ পাতা দেখো



একটা ছবির ওপরেই আর একটা ছবি! ৭১ পাতা দেখো



দশ লক্ষ বছরের পুরোনো খুলি !

তাহলে শোনো, শুরুতেই কিন্তু খোলাখুলিভাবে বলে রাখছি,—তোমার পক্ষে বেশ একটুখানি চালাক-চতুর ধরনের ডিটেক্‌টিভ্‌ হওয়া দরকার। কেননা, যে-তদন্তের ভার তুমি নিয়েছো তা আজকালকার ছেলে-ভুলোনো গোয়েন্দা-গল্পের মতো সহজ ব্যাপার মোটেই নয়। তার চেয়ে ঢের-ঢের জটিল আর ঢের-ঢের কঠিন এক তদন্তের দায়। তাই এগুতে হবে তেমনি হুঁশিয়ার হয়ে—এতোটুকু কোনো সূত্র যদি চোখ এড়িয়ে যায় তাহলে হয়তো এতোবড়ো এক আবিষ্কার থেকে আমরা ফাঁক পড়ে যাবো।

পিস্তল ? না না, পিস্তলের দরকার পড়বে না। কেননা, যাদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের এই তদন্ত তারা সবাই নেহাত

নিরীহ আর ভালোমানুষের দল। আর তাছাড়া, তারা সবাই যে কতো,—কতো,—বছর আগে বেবাক মরে গিয়েছে তার হিসেব করতে করতেই দেখবে আমাদের মাথার চুল পেকে যাবার যোগাড় হবে। তাই পিস্তল নিয়ে সত্যিই লাভ নেই। বরং পারো তো ট্যাঁকে একটা গাঁইতি ঝুলিয়ে নাও। ওটা খুব কাজে লাগবে। কেননা, তদন্তের সময় সরাতে হবে অনেক হাজার বছরের ধুলো, অনেক হাজার বছরের জঞ্জাল। মাটি খুঁড়ে মানুষের অতীত ইতিহাস বের করবার কাজ গাঁইতি-কোদাল বাদ দিয়ে চলবে কেমন করে?

তারপর এসো, আমরা দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ি আমাদের তদন্তের কাজে।

শুরুতেই বলে নিয়েছি, আমরা যেমন-তেমন এলে-বেলে ডিটেক্‌টিভ্ সাজি নি। তাই আমাদের চলন-বলন সব কিছুই একেবারে অন্য ধরনের। খুশি হলে আমরা সামনের দিকে এগুবো, খুশি হলে পেছু হটবো,—ডাইনে চলবো, বাঁয়ে চলবো, —যখন যা ইচ্ছে তাই।

শুরুতেই একটুখানি পেছু হটবার শখ হয়েছে? বেশ, তাই সই। পেছুই হটা যাক। একটুখানি কোণাকুণি চলবার শখ হয়েছে? বেশ, তাই সই। কলকাতা শহর থেকে অগ্নিকোণ-বরাবর চলা যাক। এইভাবে চলতে চলতে আমরা যে-দেশটায় গিয়ে পৌঁছলাম তার নাম হলো জাভা-দ্বীপ।

আর পেছু হটতে হটতে যে-যুগটায় গিয়ে পৌঁছলাম তার তারিখ হলো ১৮৯১।

তুমি নিশ্চয়ই এইবার অবাক হয়ে শুধোবে, থেকে থেকে জাভা-দ্বীপেই বা কেন, আর এই ১৮৯১ সালেই বা কেন?

ওই তো মজা! এ-দেশে এইমাত্র এক ভারি সন্দেহজনক জিনিস খুঁজে পাওয়া গিয়েছে যে!

কী জিনিস? চলো, নিজেরাই যাই আর পরীক্ষা করে দেখি।

সে এক কোন্ আদ্যি-কালের গুহা! আর তার মধ্যে থেকে নাকি পাওয়া গিয়েছে কার মাথার খুলির একটা ভাঙা টুকরো। আর হরেক রকম হিসেব-পত্র করে বোঝা যাচ্ছে, খুলিটা নাকি নিদেন পক্ষে লাখ দশেক বছরের পুরোনো হবে!

তাই, বৈজ্ঞানিকের দল ওটা নিয়ে রীতিমতো জটলা বাধিয়েছেন। একদল বলছেন, এ-খুলি মানুষের নয়, বন-মানুষের। কিন্তু আমরা তো আর সত্যিই হাবা-গোবা লোক নই যে ওটাকে বনমানুষের খুলি বলে চালিয়ে দিতে চাইলেই সে-কথা মুখ বুজে মেনে নেবো। তাই তোমাতে-আমাতে মিলে ঠিক করলাম, সব-প্রথম এই রহস্যেরই কিনারা করতে হবে: খুলিটা কার? মানুষের, না, বনমানুষের?

কী করে তা ঠিক করা যায়? সবচেয়ে সোজা উপায় হলো, ওই বৈজ্ঞানিকদের দলে ভিড়ে যাওয়া। আর ওঁরা

যে-সব হিসেব-পত্তর করতে শুরু করেছেন তাই নিয়েই খানিকক্ষণ মাথা ঘামানো।

প্রথম কথা হলো, খুলির টুকরোটা যদি এই রকমের হয় তাহলে আসল খুলির পুরো চেহারাটা কী রকমের হবার কথা? এ-রহস্যের কিনারা করতে পারলে আবার এক নতুন সমস্যা দেখা দেবে: পুরো খুলিটার গড়ন আর মাপজোপ যদি এই ধরনের হয় তাহলে দশ লক্ষ বছর আগে ওই খুলির মধ্যে যে-মগজটি ভরা ছিলো তার গড়ন আর মাপজোপ ঠিক কেমনতরো হবার কথা?

এ-সব সমস্যা তো সত্যিই চারটি-খানি কথা নয়। তাই, আমাদের মতো দুর্দান্ত ডিটেক্টিভ্-ও এগুলোর সমাধান করতে গিয়ে একেবারে হিমশিম খেয়ে যাবো। অথচ, যে-সব বৈজ্ঞানিকদের দলে ভিড়েছি তাঁরা সবাই হাত পাকিয়েছেন এই সব হিসেব-পত্তর নিয়েই। অতএব আমরা করলাম কী? তোমাতে-আমাতে আড়চোখে চেয়ে ওঁদের খাতা-পত্র থেকে আঁকজোঁকগুলো আমাদের নোট বইতে টুকে ফেলতে লাগলাম।

তারপর আমরা পা ছড়িয়ে বসলাম আর পেনসিল চুষতে চুষতে গভীর মনোযোগ দিয়ে অনেক কথা চিন্তা করতে লাগলাম। সামনে গভীর রহস্য—দশ লক্ষ বছর আগেকার ওই খুলির মালিকটি মানুষ ছিলো, না, বনমানুষ ছিলো? এ-সমস্যার সমাধান করা যায় কেমন করে?

তুমি হয়তো বললে, মগজটার গড়ন ঠিক কেমন ছিলো

সে-কথা তো বৈজ্ঞানিকদের খাতা থেকে টুকে নেওয়া গিয়েছে। এখন ভেবে দেখা যাক, এ-মগজ যার মাথায় ছিলো সে কথা বলতে পারতো কি না?

নিশ্চয়ই পারতো।

কিন্তু প্রমাণ?

প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ওই মগজটার গড়ন থেকেই। হিসেবে-পাওয়া মগজটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখো। দেখবে, ওটার দুদিকে,—কানের ঠিক ওপর-বরাবর দুপাশের জায়গা দুটো,—কী রকম যেন উঁচু-উঁচু মতো। এ থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয়, ওই মগজের মালিকটি নিশ্চয়ই কথা বলতে পারতো। কেমন করে প্রমাণ হয়? ওঃ, সে-কথা তো আজকালকার শরীর-বিজ্ঞান থেকে বহু আগেই আমরা জেনে রেখেছি। মগজের রকম-সকম নিয়ে আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা বহুত বহুত গবেষণা করছেন আর আবিষ্কার করছেন বহুত বহুত কথা। তার মধ্যে একটা কথা হলো, মগজের ওই জায়গা দুটির উন্নতি হলেই কথা বলতে পারা সম্ভব। তার মানে, কথা বলতে পারা-না-পারা নির্ভর করছে মগজের ওই জায়গা দুটির উন্নতির ওপরই। এ-কথা তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়ে দেওয়াও এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমাদের হাতে যদি এখন দেদার সময় থাকতো তাহলে একটা মরা কুকুর, একটা মরা বনমানুষ আর একটা মরা মানুষ যোগাড় করতাম। তারপর এই তিনটেরই খুলি ছাড়িয়ে ভেতরকার মগজগুলো বের করতাম আর সেগুলোকে পাশাপাশি

সাজাতাম। আর তারপর ভালো করে নজর দিয়ে এগুলোকে তুলনা করলেই বুঝতে পারতাম এদের মধ্যে কেন শুধু মানুষের পক্ষেই কথা বলা সম্ভব। কেননা, আমরা স্পষ্টই দেখতে পেতাম এই তিনটি মগজের মধ্যে শুধু মানুষের মগজের ওই কথা-কওয়ানে-ওয়ালা অংশগুলি উন্নত। বাকিদের বেলায় মোটেই তা নয়।

কিন্তু আমাদের হাতে তো আর এখন অতোশতো সময় নেই যে বসে-বসে মড়ার মাথার খুলি ছাড়াবো। আমাদের সামনে এখন কতো সমস্যা—কতো সমস্যার কিনারা করা দরকার।

প্রথম সমস্যা হলো, এই যে এক আদ্যিকালের গুহার মধ্যে এক টুকরো সেকেলে খুলি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, এ-খুলি আসলে কার ? মানুষের, না, বনমানুষের ? বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একদল তো বলছেন, এ-খুলি বনমানুষের। মানুষের নয়। আমরা কি সেই কথায় সায় দেবো না কি ? মোটেই নয়। কেননা, এইমাত্র আমরা দেখলুম, এ-খুলির যে মালিক ছিলো তার মগজের মাপজোপ থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে সে রীতিমতো কথা বলতে পারতো। বনমানুষ কি কোনো জন্মে কথা বলতে পারে নাকি ? তার মানে, খুলিটা বনমানুষের নয়। তার মানে, খুলির মালিকটি কি মানুষ ছিলো না কি ? এও কিন্তু বড়ো গোলমেলে প্রশ্ন হলো। কেননা, আজ-কালকার মানুষের মগজের সঙ্গে এই মগজটার যদি তুলনা করি তাহলে দেখবো কতোই না তফাত। এ-মগজ মাপে কতো

ছোটো—আজকালকার মানুষের মগজের তুলনায় প্রায় অর্ধেক! তাছাড়া, গড়নের দিক থেকেও এ-মগজটা অনেক খেলো ধরনের। তাই, ওই খুলির মালিককে মোটের ওপর মানুষ বলে মানলেও তাকে তোমার-আমার মতো তুখোড় বুদ্ধিমান মনে করা চলবে না। তার মুখে ভাষা ফুটলেও আমাদের মতো এতোশতো বোলচাল ফোটে নি। তার হালচালও নিশ্চয়ই ছিলো অনেক বেশি আড়ষ্ট, জবুথবু, জড়োসড়ো। তাই মানুষ বললেও ওকে ঠিক আজকালকার মতো মানুষ বলবার কোনো উপায় নেই। লোকটা যখন ওই গুহার মধ্যে বা আশপাশের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো তখন তাকে দেখে তুমি-আমি হয়তো ভয়েই আঁতকে উঠতাম। মনে হতো ভূত দেখছি বুঝি! তবে ভয় নেই। কেননা, সে আজ প্রায় দশ লক্ষ বছর আগেকার কথা। এ-কথা বোঝা যাচ্ছে অনেক রকম আঁক-জোঁক করে, অনেক রকমের সূত্র মিলিয়ে।

আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তো? ডারউইন বলে এক ডাক-সাইটে বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে আমরা কিছুদিন আগেই শুনে এসেছি যে আজকাল আমরা যে-সব মানুষ দেখি তারা হঠাৎ কোনো এক কালে আকাশ থেকে উড়ে এসে পৃথিবীর বুকে জুড়ে বসে নি। এই পৃথিবীর বুকেই এক রকমের বনমানুষ অনেক অনেক বছর ধরে অনেক অনেক ভাবে বদলাতে-বদলাতে শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে গিয়েছে।

দারুণ মজাদার এই গল্প। আর এই তো সেদিন আমার এক পুঁটকে ভাইঝিকে গল্পটা বলতে বলতে "যে-গল্পের শেষ নেই" বলে একটা বই লিখে ফেলেছিলাম।

তার মানে, মোটের ওপর ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? বনমানুষের দল বদলাতে-বদলাতে, বদলাতে-বদলাতে আজকের দিনের মানুষ হয়ে গিয়েছে। দশ লক্ষ বছর আগেকার ওই যে খুলির টুকরো খুঁজে পাওয়া গেলো ওর মালিককে আর বন-মানুষ বলা চলবে না। কেননা, বনমানুষের দশা পেছনে ফেলে সে অনেকখানিই এগিয়ে এসেছে। তার মুখে রীতিমতো ভাষা ফুটেছে। তাই তাকে রীতিমতো মানুষই বলতে হবে বই কি। তবু তাকে আজকালকার মানুষও বলা চলবে না। কেননা সে আজকালকার মানুষের চেয়ে দশ লক্ষ বছর পেছনে পড়ে রয়েছে। ওই খুলি থেকেই এতো কথার প্রমাণ।

তাই, ও হলো দশ-লাখ বছর আগেকার মানুষ। জাভা-র গুহায় ওর খুলি খুঁজে পাওয়া গেলো বলেই ওর নাম হলো জাভা-ম্যান্, বা, জাভার মানুষ! পৃথিবীর আর কোথাও এর চেয়ে আদ্যিকালের আর কোনো মানুষের আর কোনো রকম খুলি বা হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যায় নি। সেদিক থেকে, লোকটিকে খুবই বিখ্যাত বলতে হবে বই কি!

কিন্তু তার মানেই কি এই যে, আমরা সরাসরি বলে দিতে পারি পৃথিবীতে এর চেয়ে আগে আর কোনো মানুষ ছিলোই না?

তুমি-আমি যদি বোকা-সোকা ধরনের লোক হতাম তাহলে হয়তো ফস করে তাই বলে বসতাম। কিন্তু আমরা তো আর তা নই। তাই কথাটা বলবার আগে আমরা বেশ একটুখানি চিন্তা করে নিতে চাই। সমস্যাটা যে কী তা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। কথা হলো, মানুষের হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া না গেলেও অন্য কোনো রকমের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি না? যেমন ধরো, আফ্রিকার এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তুমি হয়তো কুড়িয়ে পেলে একটা ঘড়ি আর একটা দোনলা বন্দুক। কিন্তু আশপাশের সমস্ত এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো মানুষের টিকিটি দেখতে পাওয়া গেলো না। এমন কি, এতোটুকু একটুক্‌রো হাড়ও নয়। কিন্তু তা পাওয়া গেলো না বলেই কি বলবো যে ওই জঙ্গলের মধ্যে মানুষ কখনো যায় নি? এমনতরো কথা নিশ্চয়ই বলতে পারবো না। কেননা, অন্য চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে যে! ওই ঘড়ি আর দোনলা বন্দুক থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, এইখানে একদিন না একদিন মানুষ নিশ্চয়ই এসেছিলো।

আদ্যিকালের মানুষ নিয়েও মোটের ওপর এই রকমেরই ব্যাপার। হাড়গোড় বলতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ওই লাখ দশেক বছর আগেকার খুলির টুক্‌রো। কিন্তু তার ঢের ঢের আগেও যে মানুষ ছিলো তা প্রমাণ হচ্ছে মানুষের হাড়গোড় থেকে নয়, তার হাতের তৈরি জিনিস থেকে। সেই প্রমাণ-গুলোকে তো আর উড়িয়ে দিতে পারবে না।

স্বচক্ষে দেখতে চাও? বেশ চলো, এখান থেকে সটাং চলে যাওয়া যাক একেবারে ১৮৭৬ সালের প্যারি শহরে। গিয়ে দেখবো, বৈজ্ঞানিকদের এক গুরুগম্ভীর সভা বসেছে। তাঁদের সামনে কতকগুলো চকমকি পাথরের টুকরো। আর তাই নিয়ে সে কী তর্কবিতর্ক, বাস্‌রে! একদল বলছেন, ওগুলো নির্ঘাত মানুষের হাতের তৈরি। তার মানে, মানুষই নাকি চকমকি পাথর ভেঙে ভেঙে ওই সব টুকরোগুলো বানিয়েছিলো। আর একদল বলছেন, মোটেই তা নয়। পৃথিবীর বুকের ওপরে তো হাজারো রকমের ঝড়ঝাপ্টা লেগেই আছে। তার চোটে কতো পাথর তো কতোভাবে ভেঙে-চুরে কতো রকমের দেখতে হয়ে যায়। এগুলোও নাকি ওইভাবে ভেঙে-চুরে-যাওয়া পাথরের টুকরোই। মানুষের হাতের তৈরি বললে বিলকুল ভুল বলা হবে। এই সব বুড়ো বুড়ো লোকদের পণ্ডিতী ঝগড়াঝাঁটির চোটে কান প্রায় ঝালাপালা হয়ে যাবার যোগাড়! আর তাই শুনে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ফিসফিস করে শুধোবে, ব্যাপার কি মশায়? পাথরগুলো এলোই বা কোথা থেকে, আর এগুলো নিয়ে এতো তর্ক-ঝামেলা বাধিয়ে লাভই বা কী?

আরে বাস্‌রে! তা বুঝতে পারছো না? ওই পাথর-গুলোর সওয়াল থেকেই যে মানুষের বয়েস বিচার হয়ে যাবে—

অর্থাৎ কিনা, বুঝতে পারা যাবে কতো বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে, তাই।

সে আবার কী? দেখতে দেখতে রহস্য যেন ঘন হয়ে উঠছে! আসলে পাথরগুলো কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর এমন এক স্তর থেকে যার বয়েস হিসেব করে দেখা যাচ্ছে নিদেন পক্ষে লাখ বিশেক বছর তো হবেই। তার মানে, পাথরগুলো ঠিক ওই রকমের চেহারা নিয়েই পৃথিবীর ওইখানটিতে প্রায় লাখ বিশেক বছর ধরে পড়ে রয়েছে। তাই পাথরগুলোর ওই চেহারা যদি মানুষের দরুন হয় তাহলে মানতেই হবে, প্রায় লাখ বিশেক বছর আগে পৃথিবীর বুকে মানুষ ছিলো—হয়তো তার ঢের আগেও ছিলো, তবে এর চেয়ে পুরোনো মানুষের কীর্তির কোনো চিহ্ন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তাহলে বুঝছো, সমস্যাটা তেমন সহজ নয়!

অতএব আমরা করলাম কি, পাথরগুলোর ওপরে বেশ ভালো করে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম। পরীক্ষা করে আমাদের মনে হলো, পাথরগুলোর এই রকম চেহারা যে নেহাতই ঝড়ঝাপটার চোটে হয়েছে তা তো মনে হয় না! এর পেছনে মানুষের হাতের কারিগরি না মেনে যেন উপায়ই নেই। কিন্তু আমরা তো আর ফস করে একটা কথা বলে ফেলবার মতো বোকাসোকা লোক নই। তাই দুজনে বসে পড়লাম গালে হাত দিয়ে! ভাবলাম, দেখাই যাক না, পণ্ডিতদের মধ্যে কোন দলের জিত হয়। তারপর যে-দল জিতবে তাদের দলে ভিড়ে নিজেদেরও পণ্ডিত বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

তারপর দেখলাম, ঠিক তাই। আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম তাইই। পৃথিবীর আরো নানান জায়গা থেকে যোগাড় হতে লাগলো আরো সব রকমারি প্রমাণ যা থেকে কিনা সন্দেহের আর অবকাশই থাকে না যে ওগুলো আসলে মানুষেরই হাতের তৈরি।

যাঁরা এই কথা মানতে চাইছিলেন না তাঁদের গলা যেন আস্তে আস্তে নিভে আসতে লাগলো। পৃথিবীর আরো নানান জায়গায় খুঁজে পাওয়া যেতে লাগলো এই ধরনের পাথর।

বৈজ্ঞানিকেরা আদর করে এগুলোর নাম রেখেছেন, ইয়োলিথ বা eolith। বাংলা করে আমরা বলতে পারি, 'ভোরের পাথর'। কেননা, ইয়োলিথ কথাটাকে ভাঙলে হয় 'ইয়স্' আর 'লিথস্'—প্রথম টুকরোটার মানে হলো 'ভোর' আর দ্বিতীয়টার মানে হলো 'পাথর'। কিন্তু ওই রকম অদ্ভুত একটা আদুরে নাম কেন? কেননা, পৃথিবীতে যখন মানুষের প্রথম উদয়, বা ভোর, এগুলো যে তখনকার কালেই মানুষের হাতের তৈরি!

পাথরের যুগ থেকে লোহার যুগ পর্যন্ত

তবু কিন্তু সমস্যার শেষ হয় না। মানুষের তৈরি বলে না হয় মানা গেলো। তারপর আবার কথা ওঠে, ওই আদ্যিকালের মানুষেরা পাথর ভেঙে ভেঙে এই রকম টুকরো বানাতো কেন? এ আবার কোন ধরনের ছেলেখেলা?

না না না। ছেলেখেলা মোটেই নয়। ওগুলো না থাকলে ওদের পক্ষে তখন যে প্রাণে বাঁচাই সম্ভব হতো না। কেননা, এ-হলো অনেক অনেক লক্ষ বছর আগেকার কথা। তখন পৃথিবীর কোথাও গ্রাম বা শহরের কোনো রকম চিহ্নই নেই। শুধু বন আর জঙ্গল—আর তার মাঝে মানুষের দল হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—শুধু কিছু খাবার যোগাড় করবার আশায়, কোনোমতে প্রাণ বাঁচাবার আশায়। আর প্রাণ বাঁচানোই কি সহজ কথা নাকি? ঢাল নেই তলোয়ার নেই, তীর নেই ধনুক নেই—বন্দুক-কামানের তো কোনো কথাই ওঠে না। কোদাল নেই কুড়ুল নেই, হাল নেই লাঙল নেই—কিছুই নেই। কিংবা যা-কিছু আছে তা ওই পাথরের টুকরোগুলোই। এগুলোই তাই তখনকার দিনে ওদের হাতে একমাত্র হাতিয়ার। ওইটুকুও যদি না থাকতো তাহলে মানুষ বাঁচতো কেমন করে?

আহা! বেচারা ওই অসহায় মানুষের দল! সবেমাত্র তখন বনমানুষের দশা ছেড়ে এগিয়ে আসছে তারা। সহায় বলতে শুধু দুটো হাত আর মাথার খুলির মধ্যেকার ওই মগজ-টুকু। ওই হাত আর ওই মগজ আজকালকার মানুষের তুলনায় কতো বাজে ধরনের। কিন্তু তা হলে কী হয়? তখনকার কালে পৃথিবীর বাকি যে-সব বাসিন্দা তাদের কারুরই এমনতরো হাত নেই, এমনতরো মগজ নেই। তাই এই হাত দিয়ে মানুষ বানাতে শিখলো হাতিয়ার। এমনতরো আশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে এর আগে আর কখনো ঘটে নি। কেননা

আর কোনো জানোয়ার হাতিয়ার বানাতে পারে নি। আর তা পারে নি বলেই তারা সবাই নিছক জানোয়ার রয়ে গিয়েছে। বড়ো নিরুপায় ওরা, ওই জানোয়ারেরা—যেন পৃথিবীর দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা। কিন্তু মানুষের বেলায় তো আর তা নয়। আমরা পারি পৃথিবীকে বদল করে, নিজেদের মনের মতো করে নিতে। জঙ্গল কেটে পথ তৈরি করলাম, গড়লাম শহর, বানালাম রেলগাড়ি—এ-শহর থেকে ও-শহর পর্যন্ত হুস করে চলে যাবো। শহরে-শহরে কারখানা—এখানে জামা তৈরি হচ্ছে, ওখানে জুতো তৈরি হচ্ছে, সেখানে তৈরি হচ্ছে বিস্কুট-চকোলেট। এ-সব ব্যাপার কোনো জানোয়ার ভাবতে পারে? আমরা আর জানোয়ার নই। কেন নই? কেননা পৃথিবীকে আমরা নিজেদের মনের মতো করে বদলে নিতে পারি। কী করে পারি? কেননা আমাদের হাতে রয়েছে দারুণ ভালো হাতিয়ার। তাহলে এই হাতিয়ারের দৌলতেই মানুষের সঙ্গে জানোয়ারের আজ এতো এতো তফাত! তাই, সেই আদিম যুগে আদিম মানুষ সবপ্রথম যে হাতিয়ার বানাতে শিখেছিলো সেগুলো আমাদের আজকালকার হাতিয়ারের তুলনায় যতোই বাজে ধরনের হোক না কেন, মানুষের প্রথম কীর্তি হিসেবে সত্যিই খুব আশ্চর্য। জানোয়ারের অবস্থা থেকে আমরা আজকের যে অবস্থায় উঠে এসেছি তার জন্যে অনেক ধাপ এগিয়ে আসতে হয়েছে। আদ্যিকালের ওই হাতিয়ারগুলোই যেন তার প্রথম ধাপ। তারপর আরো ভালো, তারপর আরো আরো ভালো হাতিয়ার। এই সব সেকেলে হাতিয়ারগুলো

আজ আমাদের চোখে যেন খানিকটা ছেলেখেলার মতো লাগে। তা লাগুক। তবুও ওই থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে মানুষের আদিম ইতিহাস। তাই আগেকার কালের এই সব হাতিয়ার চোখে পড়লে আমরা সেগুলোকে যত্ন করে তুলে আনবো, যত্ন করে সাজিয়ে রাখবো যাতুঘরের আলমারিতে।

যাতুঘরে সেকালের মানুষের হাতের তৈরি জিনিস জমানো বলতে মনে পড়লো। চলো, আর একটুখানি পেছু হটে চলে যাওয়া যাক ১৮৩৬ সালের কোপেনহেগেন শহরে। শুনলাম ওখানের যাতুঘরে টম্‌সেন বলে এক পণ্ডিত এই সব আদ্যিকালের হাতিয়ারগুলো গোছগাছ করতে করতে একেবারে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। দেখাই যাক না, ব্যাপারটা কী!

ব্যাপার কী মশায়? তুমি হয়তো তাঁকে জিজ্ঞেস করলে। আমরা এমনই তুখোড় ডিটেক্‌টিভ্ সেজেছি যে ভাবখানা এই সমস্যা শুনলেই সমাধান বাতলে দেবো। টম্‌সেন বলে এই পণ্ডিতটি আমাদের হালচাল দেখে ঠিক কী ভাবলেন বোঝা কঠিন। মনে হলো তিনি যেন আপন মনেই বলছেন, প্রাচীন কালের মানুষের এতো যে-সব রকমারি কীর্তি যাতুঘরে জড়ো করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে বড়ো সমস্যা। সমস্যা হলো, এগুলোকে ঠিকমতো গোছগাছ করা যায় কী করে?

আমরা ভাবলাম, দেখাই যাক না পণ্ডিতটি শেষ পর্যন্ত কী করেন। তাই ওইখানেই আমরা কিছুদিনের জন্যে আড্ডা গাড়লাম।

তারপর দেখি, টম্‌সেন বলে এই পণ্ডিতটি বেশ খুশি হয়ে বলছেন, যাই হোক একটা হিল্লে করা গিয়েছে। প্রাচীন মানুষদের এই সব প্রাচীন কীর্তিগুলোকে সাজাতে হবে হাতিয়ারগুলো যে-মালমশলা দিয়ে তৈরি সেই মালমশলা অনুসারে। মালমশলা বলতে মোটের ওপর তিন রকম। পাথর, ব্রোঞ্জ আর লোহা। কোনো হাতিয়ার দেখছি পাথরের তৈরি, কোনোটা ব্রোঞ্জ-এর, আর কোনোটা বা লোহার। আর মানুষের আদিম ইতিহাস খোঁজ করবার ব্যাপারে তাদের তৈরি এই সব জিনিসপত্রই যেহেতু সবচেয়ে ভালো দলিল সেইহেতু মানুষের আদিম ইতিহাসকেও মোটের ওপর তিনটে যুগে ভাগ করা দরকার। পাথর যুগ। ব্রোঞ্জ যুগ। লোহা যুগ। আর এই তিনটে যুগ পরের পর ঘটেছে। সব আগে পাথর যুগ, তারপর ব্রোঞ্জ যুগ, তারপর লোহা যুগ।

ব্রোঞ্জ যুগ পাথর যুগের আগে নয় কেন? কেননা, ব্রোঞ্জ-এর তৈরি হাতিয়ার বানাতে পারা ঢের কঠিন, পাথরের তৈরি হাতিয়ার বানানো তার চেয়ে অনেক সহজ। কেন? তাও কি আবার আমাদের মতো চালাক-চতুর লোককে বুঝিয়ে দিতে হবে না কি? ব্রোঞ্জ কাকে বলে? তামা আর টিন মিশিয়ে তৈরি হয় ব্রোঞ্জ। তাহলে আমরা হিসেব করলেই বুঝতে পারবো ব্রোঞ্জ-এর তৈরি একটা হাতিয়ার বানাতে পারা কতো কঠিন সমস্যা। প্রথমত, তামা আর টিন পাওয়া যায় কেমন করে? পৃথিবীর সর্বত্রই তো আর তা ছড়ানো নেই।

কোথাও কোথাও মাটি-পাথরের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। তাহলে প্রথম সমস্যা হলো, এইসব মাটিপাথর ঠিকমতো চিনতে পারা। কিন্তু শুধু চিনলেই তো আর হলো না। তার মধ্যে থেকে তামা আর টিন উদ্ধার করবার কায়দা জানা চাই, সেগুলো মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করবার কায়দা জানা চাই, কায়দা জানা চাই এই ব্রোঞ্জ দিয়ে হাতিয়ার বানাবার। তাহলে কতো সমস্যা তা দেখতে পাচ্ছো তো। কিন্তু শুধু এইটুকু বললেই ফুরোয় না। কেননা আরো নানান সমস্যা বাকি পড়ে থাকে। বাকি সমস্যাটা হলো সমাজের গড়ন নিয়ে। মানুষ তখন সবে বনমানুষের দশা পিছনে ফেলে এগিয়ে এসেছে। তাই নেহাতই করুণ তার অবস্থা, কেননা সম্বল বলতে নেহাতই যেন কিছু নেই। বিকেল বেলায় কী খেয়ে পেট ভরবে সকাল বেলায় তার কোনো ঠিকঠিকানা থাকে না। এই অবস্থায় দলের সবাই মিলে যদি প্রাণপণ চেষ্টা না করে তাহলে খাবার জোটানোই অসম্ভব। তাই দলের মধ্যেকার সবাই মিলে হন্যে হয়ে খাবারের জন্যে ঘুরছে! কারুর পক্ষেই খাবারের খোঁজ ছাড়া অন্য কিছু করবার প্রশ্নই ওঠে না। অথচ ব্রোঞ্জ-এর হাতিয়ার তৈরি করতে হলে দলের মধ্যে কিছু লোককে শুধু এই কাজের জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে। এ-কাজ তো আর নেহাত সহজ কাজ নয়। কিন্তু কথা হলো, যাদের ছেড়ে দেওয়া হবে শুধু এই কাজের জন্যে, তাদের পেট চলবে কেমন করে? না খেয়ে তো তারা বাঁচতে পারবে না। অথচ তারাও যদি খাবারের আশায় হন্যে হয়ে ঘোরে তাহলে ব্রোঞ্জ-এর তৈরি হাতিয়ার

বানাবার লোক আর থাকবে না। তাই, দলের বাকি সব মানুষ মিলে যতোদিন পর্যন্ত না এদের জন্যে খাবার-দাবার যোগান দিতে পারে ততোদিন পর্যন্ত সম্ভবই নয় ব্রোঞ্জ-এর তৈরি হাতিয়ার গড়া। কিন্তু বাকি সবাই এদের জন্যে খাবার-দাবারের যোগান দেবে কেমন করে? তার মানেই কিন্তু বুঝতে হবে যে মানুষ তখন অনেকখানি উন্নত হয়ে উঠেছে। দলের বাকি সবাই মিলে যতোখানি খাবার-দাবার যোগাড় করতে পারে তাই দিয়ে নিছক নিজেদের পেট ভরানো ছাড়াও এই ব্রোঞ্জ-এর কারিগরদেরও পেট ভরানো সম্ভব।

তাহলে বুঝতেই পারছো, কতোদিকে কতোখানি উন্নতি হলে পরই মানুষের পক্ষে ব্রোঞ্জ-এর হাতিয়ার বানাতে পারা সম্ভব। তাই ব্রোঞ্জ যুগটা সব-প্রথম যুগ হতে পারে না। তার তুলনায় পাথরের হাতিয়ার বানানো অনেক সহজ। তাই পাথর যুগকে ব্রোঞ্জ যুগের চেয়ে আগেকার বলতে হবে। তার মানে, পাথরের তৈরি হাতিয়ার বানিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে করতে অনেক অনেক খানি জিত হবার পরই মানুষের পক্ষে ব্রোঞ্জ-এর হাতিয়ার বানানো সম্ভব। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে ব্রোঞ্জ-এর তৈরি হাতিয়ারগুলো পাথরের তৈরি হাতিয়ারের চেয়ে এতো বেশি ভালো যে একবার তা বানাতে পারলে পৃথিবীকে জয় করবার পথে যেন অনেক বেশি হুড় হুড় করে এগিয়ে চলা যায়। আর এইভাবে এগিয়ে চলতে চলতেই মানুষ শেষ পর্যন্ত আরো ভালো আরো আশ্চর্য্য

হাতিয়ার বানাতে শিখলো। সে-হাতিয়ার লোহার তৈরি। আর তখন থেকেই শুরু লোহ যুগ।

এ-সব অবশ্য ঢের ঢের পরের ব্যাপার। আমরা তো এখন মাথা ঘামাচ্ছিলাম আস্তিকালের ব্যাপার নিয়ে। সে-যুগ পাথর যুগ, কেননা পাথরের তৈরি হাতিয়ারই তখন মানুষের প্রধান সম্বল। কিন্তু শুধু ওই ভোরের পাথর নয়। চকমকি পাথরের টুকরো ভেঙে ভেঙে এই যে নেহাত ছেলেখেলার মতো পাথর বানানো—ও তো একেবারে শুরুর কথা। তারপর মানুষ অনেক হাজার বছর ধরে অনেক একটানা চেষ্টার ফলে পাথরের তৈরি হাতিয়ার বানাবারই কায়দা শিখেছে অনেক অনেক ভালো করে। তাই সব-প্রথমে এই ভোরের-পাথর বা ইয়োলিথ-এর যুগ হলেও পাথর যুগ বলতে বোঝায় অনেক অনেক পরের ব্যাপার পর্যন্ত। কতো হাজার বছর ধরে যে পাথর যুগ চলেছিলো তার হিসেব করা দায়। কিন্তু সেই যুগটার কথা একবার ভেবে দেখা যাক। মানুষের হাতে তখন পাথরের তৈরি হাতিয়ার ছাড়া আর কোনো রকম হাতিয়ার নেই। কুড়ুল বলো, কোদাল বলো—সব কিছুই পাথরের তৈরি।

কিন্তু তাও কি আবার সম্ভব নাকি? কুড়ুল-কোদাল সব কিছুই শুধু পাথরের তৈরি! এও কি বিশ্বাস করা যায়? ফোঁস করে উঠলেন একদল পণ্ডিত। বললেন, টমসেনের এ-সব কথা বিশ্বাস করবার কোনো মানে হয় না। কিন্তু ১৮৫৪ সালে সুইজারল্যাণ্ড-এ এমন এক মজার ব্যাপার হলো যে যাঁরা

টমসেনের ওই পাথর যুগকে নিছক কল্পনার ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন তাঁদের মুখ একেবারে চুন!

তাই চলো, পাড়ি দেওয়া যাক ১৮৫৪-র সুইজারল্যাণ্ড-এ। কী এমন তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছে তা একবার নিজেরাই দেখে আসি।

সত্যিই তাজ্জব ব্যাপার। সে একেবারে হৈ-চৈ কাণ্ড!

সে-বছর সুইজারল্যাণ্ড-এ বড়ো অনাবৃষ্টি। হ্রদ শুকিয়ে প্রায় মরুভূমি হয়ে যাবার যোগাড়! আর তারই চোটে একটা হ্রদের জল শুকিয়ে গিয়ে তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়েছে কোন আদ্যিকালের এক গ্রামের ভাঙা-চোরা চিহ্ন! বহুকাল আগে গ্রামটা নিশ্চয়ই চাপা পড়ে গিয়েছিলো এই হ্রদের তলায় আর যে-কোনো কারণেই হোক সেটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি, নষ্ট হয়ে যায় নি,—টিঁকে থেকেছে।

আর আমরা স্পষ্ট চোখে দেখতে পেলাম, এ-গ্রাম খাঁটি পাথর যুগের গ্রাম। এর আগেও পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে যে-সব পাথরের তৈরি হাতিয়ার খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এই গ্রামেও সেই ধরনের সব হাতিয়ার চোখে পড়ছে; তাছাড়াও চোখে পড়ছে কাঠের হাতল-ওয়ালা পাথরের কুড়ুল, সে-গাঁয়ের লোকেরা যে-জামা গায়ে দিতো তার টুকরো, এমন কি যে-রুটি খেতো তার চিহ্নও! যা দেখে আমরা সব চেয়ে অবাক হলাম তা হলো, পাথরের হাতিয়ার ছাড়া এ-গ্রামে আর কোনো রকম হাতিয়ারের চিহ্নই নেই। তার

মানে, গ্রামটা হলো একেবারে আদি অকৃত্রিম পাথর যুগের গ্রাম।

তার মানে, টম্‌সেনের ওই কথা উড়িয়ে দেবার আর কোনো রকম কায়দাই চলবে না!

সমস্ত বৈজ্ঞানিকই ক্রমশ টম্‌সেনের কথাগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

পাথর যুগ। তারপর ব্রোঞ্জ যুগ। তারপর লোহা যুগ। একটু আগেই বলেছি, এই পাথর যুগটাই সবচেয়ে বেশি দীর্ঘ। ওই ইয়োলিথ বা ভোরের পাথরগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দাও। তাহলেও, পাথর যুগ বলে যে যুগটি পড়ে থাকে তাও যে কতো হাজার বছরের ব্যাপার তারও যেন হিসেব করা চলে না! বৈজ্ঞানিকেরা তাই করলেন কি, ওই ইয়োলিথের কথা বাদ দিয়েও পাথরের যে যুগটি পড়ে থাকে তাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করলেন—এই দুটো ভাগের নাম দেওয়া হলো প্যালিওলিথিক যুগ আর নিয়োলিথিক যুগ। এই সব দাঁতভাঙা পাথুরে নামগুলো শুনেই অনেকে ঘাবড়ে যায়। আমরা কিন্তু অমন সহজে ঘাবড়াবার পাত্র নই। কেন না, চেহারায় দাঁতভাঙা হলেও আমরা ওগুলোকে ভেঙে দেখবো আসল মানেটা কী। আগেই দেখেছি, লিথস্ মানে তো পাথর। তাহলে 'প্যালিও' আর 'নিয়ো' মানে কী? প্যালিও কথার সোজা মানে হবে 'পুরোনো' আর 'নিও' কথার সোজা মানে হবে 'নতুন'। তাই, প্যালিওলিথিক যুগ মানে হবে পুরোনো-পাথর যুগ আর নিয়োলিথিক যুগ মানে হবে নতুন-পাথর

যুগ। কিংবা, আর একটু শুদ্ধ ভাষায় বললে বলতে হবে, পাথরের প্রাচীন যুগ আর পাথরের নব্য যুগ। এই দুটো যুগেই মানুষের যা-কিছু হাতিয়ার তা মোটের ওপর পাথর দিয়েই তৈরি। কিন্তু তবুও দুটো যুগের মধ্যে অনেক অনেক তফাত। প্রাচীন যুগটায় পাথরের হাতিয়ারগুলো নেহাতই বাজে ধরনের। তার তুলনায় ওই নব্য যুগের হাতিয়ারগুলো কতো ভালো বলো তো! একটু আগেই আমরা তা দেখলাম। সেই হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করেই মানুষ রীতিমতো গ্রাম গড়তে শিখেছে!

আজকের যুগেও প্রাচীন পাথরের যুগ!

এইখানে কিন্তু একটা কথা নিয়ে ভয়ানক গণ্ডগোল হয়ে যাবার ভয়। তাই এসো, তোমাতে-আমাতে মিলে সেই কথাটা বেশ ফলাও করে বুঝে ফেলি।

পাথরের যুগ আদ্যিকালের যুগ। সেইখান থেকেই মানুষের যাত্রা হয়েছে শুরু আর সেই যাত্রার ফলেই মানুষ আজ কতো—কতো—উঁচুতে উঠে এসেছে! এ-কথা সত্যি। এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর পুরো বুক জুড়ে,—সবদেশে, একসঙ্গে, একই সময়ে,—পরের পর এই যুগগুলো দেখা দিয়েছে,—এমনতরো কথা ভাবলেও নেহাতই ভুল ভাবা হবে। তার মানে, এমন কথা

বলা চলবে না যে পুরো পৃথিবী জুড়ে এককালে পুরোনো-পাথর যুগ ছিলো, তারপর এক সময়ে পুরো পৃথিবী জুড়েই সে-যুগ বদলে দেখা দিলো নতুন-পাথর যুগ, তারপর আবার ব্রোঞ্জ যুগ পুরো পৃথিবী জুড়ে, তারপর লোহা যুগ পুরো পৃথিবী জুড়ে। এইভাবে ভাবতে গেলে আমরা দারুণ ভুল করে বসবো। অবশ্যই, এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে আগে পাথর যুগ, তারপর ব্রোঞ্জ যুগ, তারপর লোহা যুগ। প্রত্যেকটি দেশের বেলাতেই এই কথা। আবার পাথর যুগের মধ্যেও আগে পুরোনো তারপর নতুন যুগ—প্রত্যেক দেশের বেলাতেই তাই। তার মানে, কোনো দেশের বেলাতেই এমন হতে পারে না যে লোহা যুগটা এলো আগে, কিংবা ব্রোঞ্জ যুগটা এলো আগে, তারপর এলো পাথর যুগ; কিংবা, নতুন-পাথর যুগটা এলো আগে, তারপর এলো পুরোনো-পাথর যুগ। কোনো দেশের বেলাতেই তা নয়। তার মানে কিন্তু এও নয় যে পুরো পৃথিবী জুড়ে, সমস্ত দেশে একই সঙ্গে, পরের পর এই যুগগুলো শুরু হয়েছে।

চলো, তোমাতে-আমাতে মিলে পৃথিবীটাকে একবার চক্কোর মেরে আসি। তাহলেই দেখতো পাবো আসল ব্যাপারটা কী রকম!

ঘুরতে ঘুরতে আমরা যদি মধ্য-অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছোই তাহলে দেখতে পাবো সেখানে আজো যে-যুগ টিঁকে রয়েছে তাকে পুরোনো-পাথর যুগ ছাড়া আর কিছুই বলা

চলবে না। তারপর সেখান থেকে পাড়ি দেওয়া যাক আর্টিক এ্যামেরিকায়, গিয়ে দেখবো হাতিয়ারের যা বহর তাতে এখনো ওদেশের অবস্থাকে নতুন-পাথর যুগ বলতে হয়। অথচ, মিশর আর মেসোপটেমিয়ায় কতোদিন আগে পুরোনো-পাথর যুগ বদলে নতুন পাথর যুগ শুরু হয়েছিলো? তা দেখতে হলে নিদেন পক্ষে হাজার-সাতেক বছর পেছু হটতে হবে। কেননা, সে-আজ সাত হাজার বছর আগেকার ব্যাপারই। অথচ, এই বদলের ঢেউটা ব্রিটেন আর জার্মানী পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লাগলো প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। ব্রিটেনে যখন সবে নতুন পাথর যুগ ভালো করে ফুটে উঠছে তখন মিশর আর মেসোপটেমিয়ায় ব্রোঞ্জ যুগই হয়েছে হাজার বছরের পুরোনো এক ব্যাপার! এদিকে ইংলণ্ডে যখন শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছে তখনো নিউজিল্যাণ্ড-এর মানুষ তাদের নতুন-পাথর যুগের পাথরের হাতিয়ারগুলোয় শান দিচ্ছে আর অস্ট্রেলিয়ায় চলেছে পুরোনো-পাথর যুগের অবস্থা!

তাহলে দেখা গেলো, সারা পৃথিবী জুড়ে একই সঙ্গে সব দেশে যে একই যুগ শুরু হয়েছে বা একই যুগ শেষ হয়েছে তা মনে করবার কোনো রকম কারণ নেই।

হাতিয়ার থেকে হাঁড়ির খবর?

ব্যাপারটা এই রকমের হয়েছে বলেই তোমার-আমার তদন্তের কাজে একটা দারুণ সুবিধে হয়ে গেলো। আমরা তো

বেরিয়েছি আদিম মানুষের হালচাল নিয়ে অনুসন্ধান করবো বলে। কিন্তু মুশকিল হলো, কোদাল-গাঁইতি দিয়ে অনেক মাটি খুঁড়েও আমরা আদিম মানুষের হাতের তৈরি যে-সব জিনিস খুঁজে পাই শুধুমাত্র সেইগুলো থেকে ওদের সম্বন্ধে অনেক খবর বার করতে পারলেও পুরো খবর তো আর বের করা চলে না। তাই সমস্যা থাকে, বাকি খবরটা বের করবো কেমন করে? এই সমস্যার কিনারা করবার একমাত্র কায়দা হলো, আজো পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যে-সব আদিম মানুষদের আড্ডা,—যারা আজো টিঁকে রয়েছে পুরোনো-পাথর যুগে, কিংবা, নতুন-পাথর যুগে,—তাদের মধ্যে গিয়ে পড়া, তাদের হালচাল নজর করা, আর তাই থেকেই হাজার হাজার বছর আগেকার পাথর যুগের মানুষদের কথা আন্দাজ করা।

এই কথা শুনে তুমি বললে, ব্যাপারটা কী রকম যেন গোলমেলে ঠেকছে। একটা নমুনা দিন। তবে বুঝতে পারবো। ধরো, সুইজারল্যাণ্ড-এর ওই আধ-শুকনো হ্রদটা দেখে ফেরবার পথে আমরা দুজনে মিশরের এক বন্দরে নেমে পড়লাম আর তারপর উটের পিঠে চেপে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলাম এমন এক জায়গায় যেখানে কিনা চার দিকে ঢিবি ঢিবি মতো বালির স্তূপ। দেখে সন্দেহ হলো, বালির ঢিবি খুঁড়ে এইখানে হয়তো আমরা খুঁজে পাবো অনেক হাজার বছর আগেকার মানুষের কীর্তি। আমরা উটের পিঠ থেকে নেমে শুরু করে দিলাম বালির ওই ঢিবিগুলো খুঁড়তে। খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে আমরা

শেষ পর্যন্ত আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে পড়লাম। কেননা, আমরা খুঁজে পেলাম এমন ভোঁতা সব পাথরের হাতিয়ার যেগুলোকে পুরোনো-পাথর যুগের হাতিয়ার বলে চিনতে একটুও খটকা হয় না। তার মানে, এইখানে নিশ্চয়ই এককালে এমন মানুষদের এক বস্তি ছিলো যারা কিনা বাস করতো পুরোনো-পাথর যুগেই।

এখন, ওইখানে ওই যে-মানুষের দল বাস করতো তাদের নিয়ে আমাদের মাথার মধ্যে কতো প্রশ্ন কিলবিল করে উঠবে! ওরা সারাদিন ধরে কী করতো? ওরা খেতো কী? কী ভাবতো?

ওরা কী খেতো তা জানবার জন্যে আমরা প্রথম অনুসন্ধান শুরু করলাম, ওদের খাবার-দাবারের কোনোরকম এঁটোকাঁটা এদিক ওদিকে কোথাও আজো টিঁকে আছে কিনা। যদি তা খুঁজে পাই তাহলে সমস্যা ওইখানেই চুকে গেলো। যেমন ধরো, যদি খুঁজে পাই কোনো জানোয়ারের আধপোড়া হাড় তাহলে অনায়াসেই বুঝতে পারবো ওরা এই জানোয়ার শিকার করে, এমন কি আগুনে ঝলসে, পেট ভরাতো। কোথাও কোথাও পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে খাবার-দাবারের কিছুকিছু এঁটোকাঁটাও খুঁজে পাওয়া যায় বই কি, আর তাই থেকে নিশ্চয়ই জানতে পারা যায় হাতিয়ারের মালিকদের হাঁড়ির খবর। আর যেখানে এঁটোকাঁটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেখানেও অন্তত কিছু কথা তো নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারা যায়। যেমন ধরো, তারা চাষবাস করে ফসল ফলিয়ে পেট ভরাতে পারতো কি না এ-কথা

তাদের হাতিয়ার দেখেই মালুম হতে পারে। পুরোনো-পাথর যুগের মানুষেরা তা পারতো না। হাতিয়ারগুলো মোটেই সে রকমের নয়। ওরা পেট ভরাতো পৃথিবী থেকে খাবার যোগাড় করে, কিন্তু পৃথিবীতে খাবার ফলিয়ে পেট ভরাবার কায়দা তাদের পক্ষে জানা সম্ভবই নয়। এ-কায়দা মানুষ প্রথম শিখলো, পুরোনো-পাথর যুগ পিছনে ফেলে নতুন-পাথর যুগে পৌঁছবার পর। কেননা, নতুন-পাথর যুগের হাতিয়ারগুলো দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় তাই দিয়ে পৃথিবীতে খাবার ফলানো সম্ভব—হাতিয়ারগুলোর প্রধান কাজই ছিলো এই রকম ভাবে খাবার ফলাবার কাজ।

পৃথিবী থেকে খাবার যোগাড় করে বাঁচা, আর পৃথিবীতে খাবার ফলিয়ে তাই খেয়ে বাঁচা—এ দুয়ের মধ্যে কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাত। মানুষ যদি ফলমূল আর শামুক-গুগলি যোগাড় করে, কিংবা জন্তুজানোয়ার মেরে আর মাছ ধরে কোনোমতে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে তাহলে বলতে হবে, সে বাঁচতে চাইছে খাবার যোগাড় করেই। কিন্তু, তার বদলে মানুষ যদি জমি চাষ করে ফসল ফলায়, পুকুরে মাছের চাষ দিয়ে আর গোয়ালে গোরু পুষে খাবারের ব্যবস্থা করতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে মানুষ শুধু খাবার যোগাড় করেই খুশি নয়, তার চেয়ে ঢের বড়ো এক ব্যাপার করছে,—পৃথিবীর বুকে খাবার তৈরি করছে আর সেই খাবার খেয়ে পেট ভরাচ্ছে। হাতিয়ারের বহর দেখেই বোঝা যায়, পুরোনো-পাথর যুগের মানুষ খাবার শুধু যোগাড় করতেই জানতো, খাবার তৈরি করবার কায়দা জানতো না।

এই কায়দা মানুষ শিখলো, নতুন-পাথর যুগের অনেক উন্নত আর অনেক ভালো হাতিয়ারের দৌলতে !

কিন্তু যে-কথা হচ্ছিলো। হাতিয়ারের হিসেব থেকে না হয় এইসব কিছু কিছু কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেলো। তবু এর পর আরো নানা রকম সমস্যা থেকে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা তখন ঠিক কেমনতরো? ওরা বাঁচতো কেমন করে? সারাদিন করতো কী? কী ভাবতো মনে মনে?

হাতিয়ারগুলোকে ভালো করে পরীক্ষা করেই তুমি হয়তো বললে, দেখুন মশায়, যাদের হাতিয়ার এই রকমের বাজে ধরনের তাদের পক্ষে অতো হাজার বছর আগেকার বনজঙ্গলে ভরা পৃথিবীতে একা-একা বাঁচাই সম্ভব নয়। একা বাঁচতে গেলে একেবারে ফৌত হয়ে যাবার কথা। তাই মানতেই হবে, ওরা তখন দল বেঁধে একসঙ্গে মিলে বাঁচবার চেষ্টা করতো।

তা তো বুঝলাম। তবু সমস্যা উঠবে, দলের গড়নটা ছিলো কী রকম? এইখানে তুমি নিশ্চয়ই একটু বেকায়দায় পড়ে যাবে। কেননা, হাজার মাটি খুঁড়েও তুমি এমন কোনো নথি-পত্র উদ্ধার করতে পারবে না যা থেকে কিনা স্পষ্ট বোঝা সম্ভব ওদের ওই দলের গড়নটার কথা। তাছাড়াও ধরো, যদি প্রশ্ন করি ওরা কী সব কথা ভাবতো তা আন্দাজ করতে পারো? এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন। কেননা, ওরা তো আর লেখাপড়া জানতো না। তাই ওরা কী ভাবতো সে-কথা কোনো পুঁথিতে লিখে যায় নি।

তাহলে উপায় ?

একটা উপায় হলো, আজকের দিনেও পৃথিবীতে,—পাহাড় আর জঙ্গলের আনাচে-কানাচে,—যেসব মানুষের দল ওই পাথর-যুগে টিঁকে রয়েছে, চলো তাদের পাড়া ঘুরে আসা যাক। দেখা যাক তাদের মধ্যে দলের গড়নটা কী রকম—তারা সারাদিন কী করছে, কী ভাবছে, এইসব ব্যাপার।

এদের এইসব হালচাল দেখে আরো একটা মস্ত সুবিধে হয়ে যাবে। ধরো, গুহায় জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে হাজার কতক বছর আগেকার মানুষদের কিছু কিছু কীর্তি আমাদের চোখে পড়েছে। অথচ এগুলোর মানে ঠিক কী,—অতো হাজার বছর আগেকার মানুষ কেন ওইসব কাজ করতো,—তা আমরা ঠিকমতো ঠাহর করতে পারছি নে। অথচ, আজকালকার পৃথিবীতে এখনো যে-সব আদিম মানুষের দল টিঁকে রয়েছে তাদের হালচাল ভালো করে দেখতে দেখতে হয়তো হঠাৎ আমরা বুঝতে পারবো, অতো হাজার বছর আগেকার মানুষ কেন এইসব কীর্তি আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছে।

একটা নমুনা দেখলেই বুঝতে পারবে ঠিক কী বলতে চাইছি। আদ্যিকালের এক গুহায় গিয়ে হয়তো দেখলাম, গুহার গায়ে আঁকা রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর ছবি। রকমারি হিসেব-পত্তর করে বুঝলাম, এ-ছবির বয়েস ঢের হয়েছে —অর্থাৎ কিনা, ঢের ঢের বছর আগেকার মানুষেরা এঁকেছে এইসব ছবি। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারা যাচ্ছে

না। গুহার গায়ে ওরা ওই-সব ছবি আঁকতে গেলো কেন? আজকালকার ছবি-আঁকিয়েরা যে-কারণে ছবি আঁকে? তা কিন্তু কিছুতেই বলা চলে না। কেননা আজকাল যারা ছবি আঁকছে তাদের মনের ইচ্ছেটা হলো, এই ছবি বাকি পাঁচজনে চেয়ে দেখুক। অথচ ওই আত্তিকালের গুহার মধ্যে ছবিগুলো হয়তো এমন বেয়াড়া বেয়াড়া জায়গায় আঁকা রয়েছে যে তার কাছে গিয়ে ছবি দেখাই প্রাণপাত কাণ্ড! তাহলে? ওরা ছবি আঁকতো কেন? কিসের তাগিদে? এই কথা ভাবতে ভাবতে তুমি হয়তো প্রায় দিশেহারা হবার যোগাড় হয়েছো। এমন সময় আমি বললাম, চলো না, আজকালকার আদিম মানুষদের হালচাল দেখে আসা যাক— তাই থেকেই হয়তো এই ছবিগুলোকে বুঝতে পারবার কোনো সূত্র পেয়ে যাবো। গিয়ে দেখি, ঠিক তাই। আজকালকার আদিম মানুষদের মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রজাল বলে এক ব্যাপার। আর তাই দেখেই বোঝা যাবে, আত্তিকালের গুহায় আঁকা এইসব ছবির আসল উদ্দেশ্য। ইন্দ্রজাল নিয়ে অনুসন্ধান একটুখানি পরে করবো। আর সেই সূত্রেই বুঝতে পারবো ওই সব ছবির রহস্য। তার আগে চলো, আজকালকার পৃথিবীতে, পাহাড়-জঙ্গলের আনাচে-কানাচে, যে-সব মানুষ এখনো আদিম দশায় পড়ে রয়েছে তাদের হালচাল খানিকটা দেখে আসা যাক। প্রথমে দেখা যাক, তাদের দলের গড়নটা কী রকম। তাই থেকেই আমাদের অনুসন্ধানে অনেক দরকারি সূত্র খুঁজে পাবো।

ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ে প্রথমটায় আমরা বেশ একটুখানি হকচকিয়ে যাবো। কেননা, ওদের সব-কিছুই আমাদের থেকে এতো তফাত মনে হবে যে আর বলবার কথা নয়।
প্রথমত দেখো, আমরা বেঁচে থাকি যে-যার নিজেকে নিয়ে। সব সময় যেন 'আমি-আমি' ভাব। আমার ছাতা আমার জুতো, আমার যশ আমার মান—সবকিছুই যেন শুধু আমার। বাকি সকলের সঙ্গে তার তফাত। বাকি সবাইও যে-যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অথচ, যে-মানুষেরা পড়ে রয়েছে ওই রকমের পিছিয়ে-পড়া অবস্থায় তাদের বেলায় একেবারে অন্য রকম। আর এই থেকেই আন্দাজ করতে পারবো, মানুষ যখন নেহাতই ছেলেমানুষ ছিলো তখন তাদের মধ্যে এই আমি-আমি ভাবটা মোটেই ফুটে ওঠে নি। তার বদলে কী রকম? এখন যে-রকম পুরো ঝোঁকটা শুধু নিজের ওপর তখন তার বদলে ঝোঁকটা ছিলো পুরো দলের ওপর। দলটাই সব, দলটাই আসল, দলটার কথা ভুলে গেলে যেন সব কিছুই ভুলে যাবার যোগাড়। আমি যেন কিছুই নই—আসল হলো আমাদের দল। তুমি যেন কিছুই নও—আসল হলো তোমাদের দল। পুরো দলের জীবন ছাড়া আমার নিজের জীবন বলতে যেন কিছু নেই, পুরো দলের জীবন ছাড়া তোমার নিজের

জীবন বলতে যেন কিছু নেই। দলটাই সব, দলটাই আসল, দলটাই চরম।

আদিম মানুষের এই যে এক একটা বড়ো বড়ো দল, এই-গুলোকেই বলে 'কোম'। সাহেবী ভাষায় বলে tribe। পুরো কোম-এর মধ্যে একই ভাষা, বাঁচবার জন্যে যা-কিছুর আয়োজন তার সবটুকুই ওই কোম-এর মধ্যেই—কোম-এর বাইরে কারুর কাছে কোনোভাবে হাত পাতবার কথা ওঠে না। আর বাইরের থেকে কেউ যদি আক্রমণ করে তাহলে পুরো কোম একেবারে একজোট হয়ে লড়ে।

আবার এই এক-একটা কোম-এর মধ্যে কয়েকটা করে ছোটোছোটো দল। সেগুলোকে বলে ক্ল্যান্ বা জেন্—clan বা gen। তার মানে, কয়েকটা করে ক্ল্যান নিয়ে একটা করে কোম। প্রতিটি ক্ল্যানের মধ্যে কিন্তু দারুণ মজার ব্যাপার। ক্ল্যানের সবাইকার ভেতর যেন একটা জোর ভাই-ভাই ভাব। ক্ল্যানের মধ্যে যারা তারা সবাই বিশ্বাস করে যে তাদের সবাইকার ভেতরে একটা রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। তারা সবাই বুঝি একই বংশের লোক।

সম্পর্কটা কী রকম অদ্ভুত গভীর দেখো। ওদের বেলায় সব-চেয়ে বড়ো যে-দুটো অপরাধ তার মধ্যে একটা হলো ক্ল্যানের একজনের পক্ষে অপর একজনের গায়ে হাত তোলা! দলের মধ্যে কাউকে খুন করা! এ-যে কতো বড়ো আর কী অসম্ভব অপরাধ তা ওরা ভাবতেই পারে না। যেন নিজের পক্ষে নিজের গায়েই হাত তোলা। তাই খুন নয়,

আত্মহত্যা। আর যে-রকম সাংঘাতিক এই অপরাধ সেই রকমেরই সাংঘাতিক হলো তার শাস্তি। কী রকমের শাস্তি? শূলে চড়ানো নয়, ফাঁসিতে ঝোলানো নয়—তার বদলে দল থেকে বের করে দেওয়া। এ-যে কী সাংঘাতিক শাস্তি তা তুমি-আমি সহজে ভাবতেই পারি নে। দলের জীবন ছাড়া নিজের জীবন বলতে তখন যে আর কিছুই নেই। তাই দল থেকে দূর করে দিলে একা মানুষ উন্মাদ পাগল হয়ে যায়—আর পাগল হয়ে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে না খেয়ে শুকিয়ে মরে!

একের সঙ্গে দলের সম্পর্ক তখন এই রকমেরই নাড়ির সম্পর্ক।

আদ্যিকালের বিয়ে

একটু আগেই তো বললাম, ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ হলো দুটো। এক, দলের একজনের পক্ষে আর এক-জনের গায়ে হাত তোলা। আর দুই হলো, ক্ল্যানের একজনের পক্ষে সেই ক্ল্যানেরই আর কাউকে বিয়ে করা। সাধারণত, জন্তুজানোয়ারের নাম থেকেই ক্ল্যানগুলোর নাম-করণ করা হতো—কেন, তা একটু পরেই দেখতে পাওয়া যাবে। আপাতত ধরো দুটো ক্ল্যানের কথা: একটার নাম হরিণ-ক্ল্যান আর একটার নাম কাছিম-ক্ল্যান্। এখন এই হরিণ-ক্ল্যানের কোনো ছেলে হরিণ-ক্ল্যানের কোনো মেয়েকে

বিয়ে করতে পারবে না। আবার, কাছিম-ক্ল্যানের কোনো মেয়ে কাছিম-ক্ল্যানের কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। এই নিয়ম। কড়া নিয়ম। এ-নিয়ম ভাঙতে গেলেও ভয়ানক কঠিন শাস্তি।

তাহলে, বিয়ের ব্যাপারটা চলবে কেমন করে?

সে বড়ো জটিল ব্যাপার। যদি বুঝতে চাও তাহলে চলো, একবার আমেরিকা ঘুরে আসা যাক। তবে ঠিক আজকের আমেরিকা নয়—১৮৭০ সাল নাগাদ কোনো একটা সময়ের। সেইখানে একজায়গায় তখন ইরোকুই নামের এক আদিম মানুষের বাস। তাদের মধ্যে গিয়ে খোঁজ করতে হবে মর্গান সাহেবকে। তাঁর কাছ থেকে এদের বিয়ে-থার ব্যাপার নিয়ে বহুত খবর পাওয়া যাবে। কেননা, ইনি এই ইরোকুইদের হালচালটা বোঝবার আশায় জীবনের প্রায় বেশির ভাগটাই এদের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। এমন কি এরাও ওঁকে ভালোবেসে নিজেদের একটি ক্ল্যানের একজন করে নিয়েছে।

আমরা হয়তো মর্গান সাহেবকে খুঁজে বার করলাম। আর তারপর হয়তো ফিসফিস করে ওঁকে শুধোলাম, কি মশায়, এদের বিয়ে-থার রকম-সকমটা কী রকম বুঝছেন?

উনি আমাদের বলবেন, একটা বড়ো গোলমালের ব্যাপার রয়েছে। চোখে তো দেখছি, এ-ক্ল্যানের একটি ছেলের সঙ্গে ও-ক্ল্যানের একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। অর্থাৎ কি না, বিয়ে হচ্ছে একজনের সঙ্গে আর একজনের। অথচ, এদের ভাষায় বাপ-মা-ভাই-বোন বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে এই

রকম বিয়ের মিল নেই। তা থেকেই সন্দেহ হয় যে আজকাল এদের মধ্যে যে-রকম বিয়ের ব্যবস্থা চালু রয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অনেক হালের ব্যাপার। অথচ ওদের ভাষায় বাপ-মা-ভাই-বোন বলতে যা বোঝায় তা থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে আগে ওদের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থাটা ছিলো অন্য রকমের। সেই ব্যবস্থার পরিচয় এখনো ওদের ভাষার মধ্যে টিঁকে রয়েছে।

মর্গানের কাছ থেকে এই কথা শুনে আমাদের দারুণ মজা লাগলো। ঠিক করলাম, এদের ভাষায় বাপ-মা-ভাই-বোন বলতে ঠিক কী বোঝায় গোড়ায় তাই বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। তারপর দেখতে হবে, ওই রকম ভাষার ব্যাপার থেকে ওদের আদ্যিকালের বিয়ের রহস্যটার কী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

আগে দেখা যাক, আমাদের ভাষায় বাপ-মা বলতে যা বোঝায় আর ওদের ভাষায় বাপ-মা বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে কতো তফাত।

বাবা বলতে আমাদের ভাষায় তো শুধু একজনকেই বোঝায়। ওদের ভাষায় কিন্তু তা নয়। জন্মদাতাকেও বোঝাতে পারে, আবার তাঁর যে-কোনো ভাইকেও বোঝাতে পারে। তার মানে, আমাদের ভাষায় 'বাবা' আর 'জেঠা-খুড়ো' শব্দের মধ্যে যে-তফাত রয়েছে ওদের ভাষায় তা নেই। বাবার যে-কোনো ভাইকেও ওরা ডাকবে 'বাবা' বলে। এমন কি, আমরা যাঁদের বলি 'বাবার খুড়তুতো ভাই', কিংবা, 'বাবার জেড়তুতো ভাই', তাঁদেরও ওরা ডাকবে শুধু বাবা বলেই।

আরো শোনো। বাবার বাবার বাবার বাবার ভাইয়ের ছেলের ছেলের ছেলের ছেলেকেও ওরা ডাকবে শুধু 'বাবা' বলেই।

'মা' বলতেও এই রকম ব্যাপার। আমরা কাকে 'মা' বলি? শুধু যাঁর পেটে জন্মেছি তাঁকেই। ওরাও নিশ্চয়ই তাঁকে মা বলবে, কিন্তু শুধুমাত্র তাঁকেই নয়। 'মা'-র সমস্ত বোনকেই ওরা বলবে 'মা', দিদিমার বোনের মেয়েকেও ডাকবে 'মা' বলে, দিদিমার দিদিমার বোনের নাতনীর মেয়েকেও বলবে শুধু 'মা'!

আমাদের ভাষায়, 'বাবা' বলতে শুধু একজনকে বোঝায়, মা বলতে শুধু একজনকে বোঝায়। আর ওদের ভাষায় দেখো। 'বাবা' বলতে বোঝায় কতোজনকে। 'মা' বলতে বোঝায় কতোজনকে!

কিন্তু মজা আছে। বাবার ভাইদের যদিও ওরা বাবা বলবে, মার ভাইদের কিন্তু বাবা বলবে না। তার বদলে ওদের ভাষায় যে-শব্দটা ব্যবহার করবে সেটা ধরো আমাদের 'মামা' ধরনের শব্দই। আর শুধু মা-র ভাইরাই 'মামা' নয়; বাবার মা-র (ঠাকুমার) ভাইয়ের ছেলেরাও হবে 'মামা'। তেমনি আবার, মা-র সমস্ত বোনকে ওরা 'মা' বলে ডাকলেও, বাবার বোনকে ওরা 'মা' বলবে না; তার বদলে বলবে পিসিমা। কিন্তু শুধু বাবার বোনরাই নয়; মা-র বাবার (দাদামশায়ের) বোনের মেয়েদেরও ওরা বলবে 'পিসিমা'।

এবার ধরো 'ভাই' আর 'বোন' বলে শব্দ। যাদের ওরা বাবা বলছে তাদের সবাইকার ছেলেদেরই ওরা বলবে 'ভাই',

মেয়েদের বলবে 'বোন'। যাদের ওরা 'মা' বলছে তাদের ছেলেদের ওরা বলবে 'ভাই', মেয়েদের বলবে 'বোন'। কিন্তু মজা হলো, বাবার বোনের আর মার ভাইয়ের ছেলেপুলেদের ডাকা নিয়ে। পুরুষেরা এক নামে ডাকছে, মেয়েরা ডাকছে আর এক নামে। ছেলেরা কী নামে ডাকছে? বাবার বোনেদের আর মার ভাইদের সমস্ত মেয়েকেই ওরা 'স্ত্রী' বলছে আর সমস্ত ছেলেদেরই ডাকছে 'স্ত্রীর ভাই' বলে। আর মেয়েরা? বাবার বোনের আর মার ভাইয়ের সমস্ত ছেলেদেরই ওরা বলছে 'স্বামী', সমস্ত মেয়েদেরই ওরা বলছে 'ননদ'। আবার তেমনি, পুরুষেরা সমস্ত ভাইদের ছেলেমেয়েদেরই ডাকছে নিজেদের ছেলে-মেয়ে হিসেবে, মেয়েরা তাদের সমস্ত বোনেদের ছেলে-মেয়েদের ডাকছে নিজেদের ছেলেমেয়ে হিসেবে! পুরুষেরা কিন্তু তাদের বোনদের ছেলেমেয়েকে আর নিজের ছেলেমেয়ের মতো ডাকছে না, মেয়েরাও তেমনি তাদের ভাইদের ছেলেমেয়েদের আর নিজের ছেলেমেয়ে হিসেবে ডাকছে না। আরো মজা হলো, একজন পুরুষ যাকে কিনা বলছে মা-র ভাই আবার তাকেই ডাকছে 'শ্বশুর' বলে ; যাকে কিনা বলছে বাবার বোন তাকেই ডাকছে 'শাশুড়ী' বলে!

তাহলে বোঝো! মর্গান সাহের কাছ থেকে এই সব ব্যাপার শুনে আমাদের মতো চালাক-চতুর লোকদেরও কী রকম হতভম্ব অবস্থা! এ-রকম ভাবে ডাকাডাকির কোনো কিনারা করতে না পেরে আমরা ওঁকে শুধোলাম, তাহলে মশায়, ব্যাপারটা কী বুঝছেন?

উনি বলবেন, ব্যাপারটা খুবই সোজা। এদের ভাষার মধ্যে যদি এই রকমের সম্পর্কের কথা টি঳কে থাকে তাহলে মানতেই হবে কোনো না কোনো সময়ে ওদের মধ্যে সম্পর্কটা সত্যিই এই রকমের ছিলো। তা না হলে ভাষার মধ্যে এ-রকম সম্পর্কের কথা আসবে কোথা থেকে?

শুনে তো আমাদের চক্ষু একেবারে চড়ক গাছ! এ আবার কোন ধরনের কথা রে বাবা! মা-র ভাই হলো কি না শ্বশুর আর বাবার বোন হয়ে গেলো কিনা শাশুড়ী? জেঠা-খুড়ো আর তাদের যতো রাজ্যের সব জেড়তুতো-খুড়তুতো ভাইয়ের দল,—সবাই কিনা হয়ে গেলো বাবা। মাসীরা আর তাদের যতো রাজ্যের মাসতুতো বোন—সবাই কিনা হয়ে গেলো মা! এ আবার কোন ধরনের সম্পর্ক আর এমনতরো সম্পর্ক সত্যি হবে কেমন করে?

মর্গান কিন্তু হেসে বলবেন, বুঝতে খটকা লাগছে? তার কারণ যে আদিম মানুষদের আসল লক্ষণটার কথা বাদ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছো। আসল লক্ষণটার কথা মনে রেখে বোঝবার চেষ্টা করো, বুঝতে আর খটকা লাগবে না।

কী লক্ষণ সেটা? সেটা হলো, ওদের কারুর জীবনই শুধু একার জীবন নয়, শুধু নিজের জীবন নয়। দলের জীবনই প্রত্যেকের জীবন—দলটাই আদত, দলটাই সব। তাই ওদের যেটা বিয়ের ব্যাপার সেটাও কারুর একার বিয়ে নয়। দলের বিয়ে—পুরো একটা ক্ল্যানের সঙ্গে অপর একটা পুরো ক্ল্যানের

বিয়ে। এই কথাটি মনে রাখলে ওদের মধ্যে এইরকমের সম্পর্কের কথা বুঝতে একটুও অসুবিধা হবে না।

একটি বরের সঙ্গে একটি কনের বিয়ে নয়। একটি ক্ল্যানের সঙ্গে আর একটি ক্ল্যানের বিয়ে। কথাটা বোঝবার জন্যে কিছু আঁকজোঁক কষতে হবে।

ধরো, একটা ক্ল্যানের নাম হলো হরিণ আর একটার নাম হলো কাছিম। দুটো ক্ল্যানেই ধরো তিন-বয়সের লোক। তাদের বলা যাক, ঠাকুরদার বয়েস, ছেলের বয়েস আর নাতির বয়েস। এখন ধরো এ-হেন দুটো ক্ল্যানের মধ্যে বিয়ে হয়েছে। তার মানে, হরিণ-ক্ল্যানের সমস্ত বুড়োরা হলো স্বামী আর কাছিম ক্ল্যানের সমস্ত বুড়ীরা হলো স্ত্রী। আবার, কাছিম-ক্ল্যানের সমস্ত বুড়োরা হলো স্বামী, হরিণ-ক্ল্যানের সমস্ত বুড়ীরা হলো স্ত্রী। আবার হরিণদের সমস্ত মাঝবয়সী পুরুষের স্ত্রী হলো কাছিমদের সমস্ত মাঝবয়সী মেয়ে আবার হরিণদের সমস্ত মাঝবয়সী মেয়ের স্বামী হলো কাছিমদের সমস্ত মাঝবয়সী ছেলে। তার পরের বয়সের ছেলেমেয়েদের বেলাতেও এই রকম—এ-দলের সমস্ত পুরুষ ও-দলের সমস্ত মেয়ের বর, ও-দলের সমস্ত ছেলে এ-দলের সমস্ত মেয়ের বর। আর বিয়েটা যদি এই রকমের হয় তাহলে ছক এঁকে-এঁকে আমরা অনায়াসেই আন্দাজ করতে পারবো বাবা-মা-ভাই-বোন-শ্বশুর-শাশুড়ী বলতে ওই রকমের অদ্ভূত সম্পর্কই বোঝাতে বাধ্য কেন।

ছেলেরা বড়ো, না, মেয়েরা বড়ো ?

এইখানে কেবল একটি কথা আছে। এ-ক্ল্যানের সঙ্গে ও-ক্ল্যানের না হয় বিয়ে হলো। তার মানে এ-ক্ল্যানের এক-বয়েসী সমস্ত পুরুষের সঙ্গে ও-ক্ল্যানের এক-বয়েসী সমস্ত মেয়ের বিয়ে ; আবার ও-ক্ল্যানের এক-বয়েসী সমস্ত পুরুষের সঙ্গে এ-ক্ল্যানের এক-বয়সী সমস্ত মেয়ের দল বেঁধে বিয়ে। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে একটা মস্ত বড়ো সমস্যা উঠবে। সমস্যাটা হলো, ছেলেপুলেদের নিয়ে। ছেলে পুলেরা কোন দলে পড়বে ? হরিণ-দলে পড়বে, না, কাছিম-দলে পড়বে ?

পৃথিবীতে আজো যে-সব কোম বা ট্রাইব টিঁকে রয়েছে তাদের হালচাল যদি ভালো করে নজর করি তাহলে এ-প্রশ্নের জবাবও পেয়ে যাবো। কেননা আমরা তখন দেখতে পাবো, ব্যাপারটা নির্ভর করছে কোমটির মধ্যে পুরুষরা বড়ো, না, মেয়েরা বড়ো —এই হিসেবের ওপর। তার মানে, কোনো কোনো কোম-এর বেলায় মেয়েরাই সমাজের মাথা। এ-হেন সব কোম-কে বলে মাতৃপ্রধান কোম। আবার, অন্য কোনো কোনো কোম-এর বেলায় পুরুষেরাই হলো সমাজের মাথা। সেই সব কোম্-কে বলে পিতৃপ্রধান কোম।

এখন, কোমটা যদি মাতৃপ্রধান হয় তাহলে ছেলেপুলেরা পড়বে

মা-র ক্ল্যানে; কোমটা যদি পিতৃপ্রধান হয় তাহলে ছেলেপুলেরা পড়বে বাবার ক্ল্যানে।

তুমি নিশ্চয়ই এতো সব গোলমেলে ব্যাপার দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে যাবে আর বলবে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে না দিলে কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে!

তাই এসো, ব্যাপারটা আরো ফলাও করেই বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

প্রত্যেক কোম বা ট্রাইবের মধ্যে কয়েকটি করে ক্ল্যান। হিসেবের সুবিধের জন্যে ধরা যাক, একটা কোম-এর মধ্যে দুটো ক্ল্যান—হরিণ-মার্কা ক্ল্যান আর কাছিম-মার্কা ক্ল্যান। এইবার ভেবে দেখো, কোমটা যদি পিতৃপ্রধান হয় তাহলে ছেলেপুলেরা সবাই কোন দলে পড়বে আর কোমটা যদি মাতৃপ্রধান হয় তাহলেই বা ছেলেপুলেরা কোন দলে পড়বে।

ধরো কোমটা পিতৃ-প্রধান। সেই কোম-এর মধ্যে, হরিণদের সঙ্গে কাছিমদের বিয়ে হলো। তার মানে, কাছিমদলের পুরুষদের সঙ্গে হরিণদলের মেয়েদের বিয়ে হলো; আবার হরিণদলের পুরুষদের সঙ্গে কাছিমদলের মেয়েদের বিয়ে হলো। তারপর ছেলেপুলে হলো। এইসব ছেলেপুলেদের মধ্যে অনেকের বাবা হলো কাছিমদলের লোক, আবার অন্য অনেকের বাবা হলো হরিণদলের লোক। যাদের বাবা কাছিমদলের তারা পড়বে কাছিমদলে; যাদের বাবা হরিণদলের তারা পড়বে হরিণদলে। এমনতরো কেন? কেননা, কোমটাই যে পিতৃপ্রধান! কিন্তু তা যদি না হতো? কোমটা যদি হতো মাতৃপ্রধান? তাহলে

ঠিক এর উলটো ব্যাপার হতো। যেসব ছেলেপুলেদের মা কাছিমদলের তারা সবাই পড়বে কাছিমদলে ; যাদের মা হরিণ-দলের তারা সবাই পড়বে হরিণদলে।

মাতৃপ্রধান আর পিতৃপ্রধান—এই দুরকম ব্যাপার শুনে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেলে। এ রকম আবার হয় না কি ? আমরা তো জানি, চাটুজ্যের ছেলে চাটুজ্যে হয়, দাসের ছেলে দাস হয়, ঘোষের ছেলে ঘোষ হয়। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এ হলো নেহাতই পিতৃপ্রধান সমাজের ব্যাপার। এ ছাড়াও আর এক রকম হতে পারে, তারই নাম মাতৃপ্রধান সমাজ। সে সমাজে মেয়েরাই বড়ো। বিশ্বাস হচ্ছে না ? বেশ চলো, আমাদের দেশেরই কয়েকটা অঞ্চল তোমাকে একটু ঘুরিয়ে আনি। তুমি তাহলে স্পষ্ট চোখে দেখতে পাবে আজো আমাদের দেশের জায়গায় জায়গায় কী রকম ভাবে মাতৃপ্রধান সমাজ টিঁকে আছে। কোন দিকে যাবে ? নানান দিকে যাওয়া যায়। উত্তর দিকে গারো পাহাড়ের অঞ্চলে যেতে পারো, দক্ষিণ দিকে কেরালা অঞ্চলে যেতে পারো।

কিন্তু সামনেই আবার এক রহস্য !

কিসের রহস্য ? ওই মাতৃপ্রধান আর পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা নিয়ে। কোথাও বা এই ব্যবস্থা, কোথাও বা ওই ব্যবস্থা ! কিন্তু কেন ?

এই কথাটা বুঝতে হলে আজকের পৃথিবীতে এখনো যেসব কোম সমাজ টিঁকে রয়েছে সেগুলোর ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে আসতে হবে। এই সব কোম-সমাজের আসল সমস্যাটা

কী? খাবার। খাবার না হলে বাঁচবার যো নেই, অথচ ওদের হাতিয়ার আজকের তুলনায় এমনই খেলো ধরনের যে তার সাহায্যে খাবার যোগাড় করা নেহাত চারটিখানি কথা নয়। তাই, খাবার পাবার কায়দা-কানুনই তাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাবো, এই কায়দা-কানুনের দিক থেকে কোম সমাজগুলোকে মোটের ওপর তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক হলো, শিকার করাই কিনা যাদের কাছে সব-প্রধান কাজ। শিকারের সাহায্যে খাবার যোগাড় করা আর তাই খেয়েই প্রাণধারণ। দ্বিতীয় হলো, পশুপালন —পশুপালনের সাহায্যেই যাদের প্রাণধারণ। আর তৃতীয় হলো, চাষবাস।

এখন এই যে তিন রকমের কাজ, এর মধ্যে দেখো কোন কাজের বেলায় দলের মেয়েদের ওপর দায়িত্ব বেশি আর কোন কাজের বেলায় দলের পুরুষদের ওপর দায়িত্ব বেশি। তারই ওপর নির্ভর করবে, ছেলেরা বড়ো না মেয়েরা বড়ো হবে। তার মানে খাবার যোগাড়ের কাজে ছেলেরাই যদি বড়ো হয় তা হলে সমাজও হবে পিতৃপ্রধান, মেয়েরাই যদি বড়ো হয় তাহলে সমাজটা হবে মাতৃপ্রধান।

মানুষ যতোদিন ভালো করে শিকার করতেও শেখেনি, ফলমূল যোগাড় করে কোনোমতে প্রাণ বাঁচাতো, ততোদিন পর্যন্ত কিন্তু দলের মধ্যে মেয়েরাই প্রধান। কেননা, খাবার যোগাড় করবার সময় পুরুষ আর মেয়ে সবাই মিলে খাবার যোগাড় করছে, কিন্তু মেয়েদের ওপর তা ছাড়াও বাড়িতে

দায়িত্ব রয়েছে—কচি ছেলেপুলে মানুষ করা, ইত্যাদি। তাই এই বাড়তি দায়িত্বের জন্যেই মেয়েদের বাড়তি খাতির। তারপর মানুষের হাতিয়ার উন্নত হতে লাগলো, মানুষ শিখলো বর্ষা-বল্লম হাতে শিকার করতে। শিকারের কাজটা কিন্তু মেয়েদের কাজ নয়, ছেলেদের কাজ। তাই ছেলেরাই হয়ে উঠতে লাগলো প্রধান, মেয়েরা হারাতে লাগলো তাদের আগেকার গৌরব। শিকারী কোমগুলি পিতৃপ্রধান হয়ে উঠতে লাগলো। শিকার করতে করতেই পশুপালন শেখা; তাই পশুপালনের ওপর নির্ভর যে-সব কোমের সেই সব কোমগুলিতে পিতৃপ্রধান ব্যবস্থা আরো জাঁকিয়ে বসলো। ব্যাপারটা কিন্তু উলটে গেলো চাষবাস শেখবার একেবারে শুরুর অবস্থায়। কেননা, চাষবাস শেখবার শুরুটা ভারি মজার ব্যাপার। শিকার আর পশুপালন শিখে পুরুষেরা তো তাই নিয়েই আছে; এদিকে কিন্তু মেয়েরা ফলমূল কুড়োনোর বা যোগাড়ের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই চালিয়ে যেতে যেতে তারা ক্রমশ আস্তানার আশপাশে গাছ পুঁততে শিখছে। সেগুলো ঠিক চাষের জমি নয়। বরং বাগান ধরনের ব্যাপার। এইভাবে বাগান করতে পারা থেকেই কিন্তু চাষবাসের শুরু আর এই বাগান করবার কাজটা শুরু করেছিলো মেয়েরাই। তাই যখন চাষবাসের শুরু তখন আবার মেয়েদের দায়িত্বই ঢের বেশি। এই জন্যই তো সব দেশের পৌরাণিক গল্পে দেখা যায় মানুষকে চাষবাস করতে শিখিয়েছে কোনো না কোনো দেবী, দেবতা নয়। তার

মানে মেয়েরাই, ছেলেরা নয়। তাই চাষবাসের ব্যাপারে যে-সব কোম-এর সবে হাতেখড়ি হয়েছে সেগুলো আর পিতৃ-প্রধান নয়, তার বদলে মাতৃপ্রধান। কিন্তু মানুষ তো শুধু ওই রকমের চাষবাসের হাতেখড়িটুকু শিখেই চুপটি করে বসে থাকেনি। চাষবাসের ব্যবস্থা ক্রমশ উন্নত করে চলেছে। এই ভাবে এগুতে এগুতে মানুষ যখন বড়ো বড়ো খেতে হালবলদ দিয়ে চাষ করবার অবস্থায় এসে পৌঁছলো তখন দেখা গেলো কাজের প্রধান দায়টা আবার পুরুষদেরই ওপর। এই অবস্থায় সমাজের গড়নটাও তাই আবার পিতৃপ্রধান হয়ে গেলো।

তাহলে পিতৃপ্রধান আর মাতৃপ্রধান সমাজের যে-সমস্যা তার একটা কিনারা করা গেলো। আসল কথা হলো খাবার পাবার যে-ব্যবস্থা তার কথা। সেই ব্যবস্থায় পুরুষ যদি প্রধান হয় তাহলে সমাজটা হবে পিতৃপ্রধান। আর মেয়েরা যদি প্রধান হয় তাহলে সমাজটা হবে মাতৃপ্রধান।

জানোয়ারের নাম থেকে মানুষের নাম?

যে-তদন্তের কাজে হাত দিয়েছি সেটা বাস্তবিকই কী কঠিন! রহস্যের পর রহস্যের ঢেউ। একটা ঢেউ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে সামনে আর একটা প্রকাণ্ড রহস্য!

পিতৃপ্রধান আর মাতৃপ্রধান সমাজের সমস্যাটা না হয়

বুঝতে পারা গেলো। কিন্তু তা বুঝতে না বুঝতেই সামনে আর এক বিরাট সমস্যা।

সমস্যাটা হলো, ওদের ওই ক্ল্যানগুলোর নামকরণ করার ব্যাপার নিয়ে। কেননা, এই নামকরণের রীতিটা বড়ো অদ্ভুত। বেশির ভাগেরই নাম কোনো না কোনো জন্তুর নাম, অবশ্য ফুলের নাম বা গাছের নামও বাদ যায় না। কোনো ক্ল্যানের নাম হরিণ ; কারুর নাম ভালুক, কারুর নাম দাঁড়কাক, আবার সূর্যমুখী নাম কারুর বা। ব্যাপারটা বেশ একটুখানি রহস্যজনক মনে হয় না কি?

আমরা তাই ওদের একজনকে ধরে শুধোলাম, বাপুহে, তোমাদের এই নামকরণের ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দেবে? নাম দিতে চাইছো মানুষের দলের ; অথচ নামটা নিচ্ছো জন্তুজানোয়ারদের কাছ থেকে! এ-আবার কোন ধরনের ব্যাপার?

যাকে ধরে শুধোচ্ছিলাম সে বুঝি এক হরিণ-ক্ল্যানের লোক। লোকটা আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো, মনে হলো প্রশ্নটাই বুঝতে পারছে না! ভাবলাম, ওকে আর একটু বুঝিয়ে বলা ভালো। তাই আবার বললাম, তোমাদের এই দলটার ব্যাপারই ধরো না কেন! দলটা তো মানুষের দল, অথচ নামটা হরিণ হলো কেন?

এই না শুনে ও আমাদের বললো, কোথাকার বেকুব লোক হে তোমরা? হরিণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা যে কতো নিকট তা দেখতে পাচ্ছো না? আমরা সবাই আসলে যে হরিণই!

হরিণ থেকেই আমাদের এই দলের জন্ম। তাই দলটার নাম হরিণ হবে না তো কি হাতি-ঘোড়া হবে?

এই না শুনে আমাদের দুজনের চোখ তো একেবারে ছানাবড়া! বললুম, বলো কি হে? হরিণ থেকেই তোমাদের দলের জন্ম? তোমরা সবাই আসলে হলে হরিণ?

লোকটা বললো, পারিনে বাপু তোমাদের সঙ্গে তর্ক করতে। আমার এখন ঢের কাজ।

বলে, লোকটা হনহন করে চলে গেলো।

অগত্যা আমরা গেলুম কাছিম-দলের কাছে। কিন্তু তাদের মুখেও ওই একই কথা! কাছিম থেকেই নাকি তাদের দলের জন্ম, কাছিমের সঙ্গে নাকি তাদের একেবারে নাড়ির সম্পর্ক, তারা সবাই আসলে নাকি কাছিমই।

কিছুই যেন মাথামুণ্ডু বুঝতে পারি নে। ভাবলাম, সূর্যমুখী দলের কাছে একবার যাওয়া যাক।

গিয়ে মনে হলো, এ-যেন একেবারে পাগলের প্রলাপ! কেননা ওরাও বলছে, সূর্যমুখী ফুল থেকেই ওদের দলের জন্ম, সূর্যমুখীর সঙ্গে ওদের তাই নাড়ির সম্পর্ক, ওরা সবাই আসলে নাকি সূর্যমুখীই।

ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা যেন হদিস পাওয়া গেলো আমেরিকার একদল আদিম অধিবাসীদের মধ্যে গিয়ে। তাদের যে-কোম সেই কোমটার নাম হলো ওজিবওয়ে। ওদের মধ্যে গিয়ে শুনতে পেলাম একটা নতুন শব্দ। শব্দটা হলো টোটেম। যে-জানোয়ার থেকে ওরা ওদের ক্ল্যানগুলোর নামকরণ করে

সেই জানোয়ারকে ওরা বলে ক্ল্যানের টোটেম। এক-এক ক্ল্যানের এক-এক টোটেম। কারুর টোটেম হরিণ, কারুর টোটেম কাছিম, কারুর টোটেম সূর্যমুখী। এই টোটেমই হলো ক্ল্যানটির চিহ্ন। শুধু চিহ্নই নয়, ওই টোটেমই বুঝি রক্ষা করছে পুরো ক্ল্যানকে!

টোটেম বলে শব্দটাই নেওয়া হয়েছে ওই ওজিবওয়েদের ভাষা থেকে, আর ওদের মুখে এই শব্দটা শুনে আমিও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হলো এতোক্ষণে রহস্যের একটা কিনারা পাওয়া গেলো। কেননা, আমি তো জানি আজকালকার নানা বৈজ্ঞানিক এই টোটেম বলে ব্যাপার নিয়ে নানান অনুসন্ধান করছেন। তাই রহস্যের কিনারা করবার সবচেয়ে সোজা উপায় হবে তাঁদের কাছ থেকে টোটেম সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে আসা।

অতএব আমরা বনজঙ্গল ছেড়ে চললাম তাঁদেরই কাছে যাঁরা কিনা এই টোটেম নিয়েই অনুসন্ধান করছেন বিস্তর। কিন্তু গিয়ে দেখি, হা কপাল, তাঁদের মধ্যেও হাঙ্গামার অন্ত নেই। কেননা, নামকরা বৈজ্ঞানিক হলে কী হয়, এঁদের মধ্যেও যেন নানা মুনির নানা মত। অনেকেই অবশ্য অনেক কোম-এর মধ্যে ঘুরেছেন, স্ব-চক্ষে দেখেছেন অনেক কিছু। মতের ঝগড়াঝাঁটি কিন্তু এইসব চোখে দেখা ব্যাপার নিয়ে নয়। তার বদলে, ব্যাখ্যা করা নিয়ে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তো? টোটেম নিয়ে আদিম কোমগুলির মধ্যে অনেক রকম ব্যাপার তো চোখে দেখলুম; কিন্তু কথা হলো, কেন? কেন

ওদের মধ্যে এই সব এতো রকমের ব্যাপার? ওই পিছিয়ে-পড়া মানুষদের যদি শুধোও, টোটেম নিয়ে তোমাদের এতো আদিখ্যেতা কেন হে বাপু? তাহলে ওরা তোমার কথা বুঝতেই পারবে না। তার বদলে, ওরা হয়তো নিজেদের দলের সবাইকে ডাক দিয়ে বলবে, চলো চলো, আজ আমাদের টোটেম-উৎসব—দল বেঁধে তালে তালে নাচতে হবে।

যাদের টোটেম সূর্যমুখী, তারা চলবে সূর্যমুখীর জঙ্গলে। যাদের টোটেম কাছিম, তারা চলবে কাছিমেরা যেখানে বাচ্চা পাড়ে সেই জায়গায়।

আর সেখানে গিয়ে ওরা দল-বেঁধে তালে তালে নাচতে শুরু করবে। এ-নাচ তাদের টোটেম-নাচ!

আমরা এ-পণ্ডিতকে শুধোই, ব্যাপারটা কী বুঝছেন? আমরা ও-পণ্ডিতকে শুধোই, ব্যাপার কী বুঝছেন? কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যে-জবাব পাই তাতে মন কিছুতেই খুশি হয় না। আমাদের কেবলই মনে হয়, টোটেম নিয়ে এতো যে ব্যাপার, এর নিশ্চয় কোনো না কোনো মানে আছে। অথচ মানেটা যে ঠিক কী তা কিছুতেই ঠাহর করতে পারি নে!

পণ্ডিতদের পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত খবর পাওয়া গেলো, বার্মিংহাম শহরে বুঝি এমন এক পণ্ডিত আছেন যিনি কিনা এই টোটেম বলে ব্যাপারটির আগাপাস্তলা মিলিয়ে দারুণ ভালো একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নাম তাঁর জর্জ টম্‌সন্‌।

আমরা তাই রওনা হলাম বার্মিংহাম। আর সেখানে গিয়ে খুঁজে বের করলাম জর্জ টমসন্‌কে। আর আমরা ভারি খুশি

হয়ে গেলাম। কেননা, অতো বড়ো পণ্ডিত হলে কী হয়, তিনি কঠিন কথাও এমন সহজ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে বুঝতে আমাদের একটুও কষ্ট হয় না।

উনি বললেন, টোটেম-রহস্য নিয়ে যদি অনুসন্ধান করতেই চাও তাহলে কয়েকটা মূল-সূত্রের দিকে নজর রাখতে হবে। প্রথমত পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যতোরকম টোটেমের খবর পাওয়া গিয়েছে তার যদি একটা ফর্দ তৈরি করো তাহলে দেখবে বেশির ভাগ টোটেমই হলো খাবার জিনিস! পশুপাখি, গাছগাছড়াই বেশি—আর এগুলো খেয়ে পেট ভরানো সত্যিই সম্ভব। অবশ্য কিছুকিছু টোটেমের খবর পাওয়া যায় যেগুলো কিনা খাবার জিনিস নয়। যেমন ধরো, বৃষ্টি, পাথর বা ওই ধরনের কিছু। কিন্তু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, এইগুলো ঠিক আদি-অকৃত্রিম টোটেম নয়, এগুলো অনেক পরের ব্যাপার। ওই সুখাদ্য টোটেমগুলির নকল হিসেবেই এই অখাদ্য টোটেম-গুলোর জন্ম। তাই টোটেম-ব্যাপারের আসল রহস্য খুঁজতে গেলে এই নকল টোটেমগুলোর কথা বাদ দেওয়াই ভালো।

আমরা দুজনে টোটেমের ফর্দটা পরীক্ষা করে দেখলাম আর বললাম, আরে তাইতো! এ-কথা তো এর আগে আমাদের মাথাতেই আসে নি!

উনি বললেন, তাহলে এইটুকু সূত্র থেকেই নিশ্চয় সন্দেহ করা যেতে পারে যে আদিম মানুষের খাবার যোগানোর সঙ্গে এই টোটেমগুলির যোগাযোগ ছিলো!

ফর্দ দেখে তো তাই সন্দেহ হয়।

উনি বললেন, আরো একটা খুব জরুরী সূত্র রয়েছে। আদিম কোমগুলির মধ্যে তোমরা যদি ঘুরে থাকো তাহলে নিশ্চয়ই ওদের টোটেম-উৎসব বলে অতো-বড়ো উৎসবটার ব্যাপার তোমাদের নজরে পড়েছে। নামেই মালুম, উৎসবের সবটুকুই ওদের ওই টোটেমকে ঘিরে। কিন্তু যেটা খুব খুঁটিয়ে দেখা দরকার সেটা হলো ওদের এই উৎসবের স্থান-কালটা। টোটেম-উৎসবের সময় ওদের পুরো দলটা এক জায়গায় জড়ো হয়—কিন্তু যেখানে-সেখানে নয়, যখন-তখন নয়। জড়ো হবার জায়গাটা বাঁধা-ধরা। জায়গাটা হলো, টোটেমদের ঘাঁটি, সময়টা হলো টোটেমদের বাচ্চা পাড়বার সময়। ধরো, কাছিম-দলের কথা। উৎসবের জন্যে ওরা জমায়েত হবে কাছিমদের আড্ডায় আর কাছিমেরা যে-সময়টায় বাচ্চা পাড়ে সেই সময়টায়।

এইবার, জর্জ টমসন বলবেন, একটা খুব সোজা প্রশ্নের উত্তর দাও। একদল আদিম মানুষ জমা হলো কাছিমদের আড্ডায়, কাছিমরা যে-সময়টায় বাচ্চা পাড়ে সেই সময়টায়। এ-থেকে কী প্রমাণ হয়? কেন ওরা জড়ো হচ্ছে? উদ্দেশ্যটা কী হতে পারে?

এ-প্রশ্নের শুধুমাত্র একটি জবাব সম্ভব। ওরা জমা হচ্ছে, কাছিম ধরবার জন্যে। কাছিম ধরে কাছিম খাবে। কাছিম খেয়ে জান বাঁচবে।

মনে রাখতে হবে, এই টোটেম বলে ব্যাপারটি শুরু হয়েছে এমন এক আদিম যুগে যখন মানুষের আদিম দল

হন্যের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবারের সন্ধানে। হাতিয়ার তখন এমনই বাজে ধরনের যে তাই দিয়ে হরেক রকম খাবার যোগাড় করবার কথাই ওঠে না। বনে-জঙ্গলের যে অঞ্চলে ওরা হন্যে হয়ে ঘুরছে সেই অঞ্চলে শুধুমাত্র যে-খাবারটার সহজ যোগান সেই খাবারটা খেয়েই তাদের জান বাঁচে। তাই যারা কাছাকাছি কাছিম যোগাড় করতে পারে তাদের পক্ষে শুধু কাছিম খেয়েই বাঁচা। কাছিম ছাড়া ওরা তাই নিজেদের কথা ভাবতে পারে না—কাছিমই ওদের দলের সবচেয়ে বড়ো রক্ষক, কাছিমের সঙ্গে ওদের আত্মীয়তা বড়ো গভীর, কাছিম থেকেই ওদের জন্ম—ওরা আর কাছিম তাই আলাদা নয়। অর্থাৎ কিনা ওদের টোটেম হলো কাছিম।

এরপর, অবশ্য, মানুষের সেই আদিম দলের হাতিয়ার উন্নত হয়েছে। আর তাই, শুধুমাত্র একরকম খাবারের সন্ধান নয়, সম্ভব হয়েছে কয়েক রকম খাবার যোগাড় করা। শুধু তাই নয়; দলের মানুষও অনেক বেড়েছে, বাড়তে বাড়তে দলটা অনেকগুলো ক্ল্যানে ভাগ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভাগ হয়ে গেলেও, এ-ক্ল্যানের সঙ্গে ও-ক্ল্যানের সম্পর্ক বড়ো গভীর: এ-ক্ল্যানের সাহায্যে ও-ক্ল্যানের পক্ষে বেঁচে থাকা, ও-ক্ল্যানের সাহায্যে এ-ক্ল্যানের পক্ষে বেঁচে থাকা। এই অবস্থায় কী ব্যবস্থা হলো? ব্যবস্থা হলো, আমাদের ক্ল্যান তোমাদের ক্ল্যানের খাবারের ওপর ভাগ বসাবে না, তোমাদের ক্ল্যান আমাদের ক্ল্যানের খাবারের ওপর ভাগ বসাবে না। যেমন ধরো, হরিণ-ক্ল্যান আর সূর্যমুখী ক্ল্যান। হরিণ-ক্ল্যানের ওরা

বললো, আমরা আর হরিণ খাবো না; এ-খাবার অন্য ক্ল্যানের খাবার হোক। সূর্যমুখী ক্ল্যানের ওরা বললো, আমরা আর সূর্যমুখী খাবো না; এ-খাবার অন্য ক্ল্যানের খাবার হোক। হরিণ যা যোগাড় হবে তা নেবে সূর্যমুখী-ক্ল্যানের ওরা; সূর্যমুখী যা যোগাড় হবে তা নেবে হরিণক্ল্যানের ওরা। এরই নাম সহযোগিতা—একটা পুরো ক্ল্যানের সঙ্গে আর একটা পুরো ক্ল্যানের সহযোগিতা। আর এই সহযোগিতার খাতিরেই প্রতিটি ক্ল্যানের মধ্যে নতুন নিয়ম জারি হলো: হরিণ-ক্ল্যানের পক্ষে হরিণ খাওয়া বারণ, কাছিম ক্ল্যানের পক্ষে কাছিম খাওয়া বারণ। এই রকম হরেক রকমের সব বারণ। এই 'বারণ'-গুলোকে বলা হয় ট্যাবু বা taboo।

এই না শুনে তোমার চোখ প্রায় চকচক করে উঠলো। তুমি বললে, আরে তাইতো! আমাদের দেশে আমাদের সমাজে আজো যে এই রকম ব্যবস্থার ভাঙা-চোরা অংশ চোখে পড়ে। যেমন ধরো, যারা কাশ্যপ গোত্র তাদের পক্ষে কাছিম খাওয়া বারণ।

শুনে কিন্তু জর্জ টমসন খুব বেশি অবাক হবেন না। উনি বলবেন, শুধু তোমাদের দেশে কেন, নানান দেশে নানান ভাবেই তো আদিম টোটেম-বিশ্বাসের চিহ্ন টিঁকে রয়েছে। তোমাদের আরো তুচারটে খুব মজার নমুনা দেখিয়ে দিতে পারি। যদি ভালো করে খতিয়ে দেখতে পারো তাহলে দেখবে নানা রকম ঠাকুর-দেবতার জন্ম হলো এই টোটেম-বিশ্বাস থেকেই। তোমাদের দেশের গণেশ ঠাকুরের কথাই ভেবে

দেখো না—তাঁর হাতির মতো মাথাটা এলো কোথা থেকে? প্রাচীন মিশরের দেবদেবীদের যদি দেখো তাহলে দেখবে তাদের চেহারায় জন্তুজানোয়ারের কতো অঙ্গ থেকে গিয়েছে। এগুলো সবই টোটেমের ভগ্নাবশেষ। আর গ্রীক দেবদেবীদের জন্মের সঙ্গে আদিম টোটেমের সম্পর্ক যে কতোখানি তা যদি জানতে চাও তাহলে আমার লেখা পুঁথিগুলো পড়ে দেখতে পারো। তাছাড়া প্রাচীন কালের ঢাল-তলোয়ারের ওপরেও দেখবে নানা রকম জন্তুর ছবি—যে জানোয়ারটি হলো আমাদের দলের টোটেম সেই জানোয়ারটির ছবি আমাদের ঢালে আঁকা থাকবে। এই রকমের ব্যবস্থা আর কি!

এই না শুনে আমরা ভাবছি বেরিয়ে পড়বো যাদুঘরগুলো ঘুরে আদ্যিকালের ঢাল-তলোয়ারগুলো দেখে আসবার জন্যে। উনি কিন্তু আমাদের ডেকে বললেন, তা যাদুঘরগুলো ঘুরে আসতে চাও সে তো খুব ভালো কথাই। তাছাড়াও কিন্তু আদিম কোমগুলো আর একবার ঘুরে এসো। কেননা, টোটেম সম্বন্ধে এই যে খবরটি পেলে এই খবরটি মনে রেখে ওদের টোটেম-নাচ একবার দেখে নিও। তাহলে আদিম মানুষের জীবনে নাচটা যে কেন অতোখানি জরুরী ব্যাপার তাও আন্দাজ করতে পারবে।

নাচ দেখতে আমারও খুব ভালো লাগে, তোমারও খুব ভালো লাগে। তাই আমরা ঠিক করলাম, বরং আগে ওদের নাচটাই দেখে আসা যাক।

গিয়ে পড়লাম এক আদিম কোম-এর মধ্যে। সেদিন ওদের জোরপরব। টোটেম-উৎসব। তাই, টোটেমের ঘাঁটিতে ওরা সবাই জড়ো হয়েছে আর শুরু করছে নাচতে। কী নাচ! কী নাচ! কী আশ্চর্য নাচ! দেখতে দেখতে সত্যিই যেন মন ভরে যায়। দল বেঁধে, তালে তালে ওদের ওই আশ্চর্য নাচ!

আমরা কিন্তু তো শুধুই ফ্যালফ্যাল করে নাচ দেখবার জন্যে এতোদূর আসি নি। মনে আছে তো, আমাদের ওপর কঠিন তদন্তের ভার! আমরা তাই খুব হুঁশিয়ার হয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলাম ওদের ওই নাচের মধ্যে থেকে কোনো রকম রহস্যের সূত্র পাওয়া যায় কী না!

ভালো করে নজর করতে করতে কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে আমাদের সত্যিই কী রকম যেন খটকা লাগলো। নাচের সময় ওরা কী রকম যেন জন্তুজানোয়ারকে নকল করবার চেষ্টা করছে। কোন জন্তু ? ভালো করে দেখি, এটা যে হরিণ! আর তখুনি আমাদের মনে পড়ে গেলো, আরে এটা যে হরিণ

ক্ল্যানেরই ব্যাপার! তার মানে ওদের টোটেম হলো হরিণ আর টোটেম-উৎসবের যে-নাচ সেই নাচের মধ্যে এই হরিণকেই নকল করবার চেষ্টা!

তার মানে? ব্যাপারটা কী?

মনে পড়ে গেলো জর্জ টমসনের সেই কথাগুলো। শুরুতে এই টোটেমই ছিলো ওদের পক্ষে প্রধান খাবার। তাই যদি হয়, তাহলে এই টোটেম-উৎসবের দিন টোটেমটিকে নকল করবার একটা কোনো গূঢ় কারণ থাকতে পারে বই কি!

যাদের টোটেম হরিণ তারা নাচছে হরিণের নাচ। আর এই হরিণ-নাচ নাচবার সময় হরিণের হালচাল নকল করবার দারুণ উৎসাহ। কিন্তু তাতে লাভটা কী?

তুমি বললে, লাভটা বুঝতে পারছেন না মশায়? হরিণ শিকার করবার সময় হরিণের হালচাল যদি খুব ভালো করে জানা থাকে তাহলে শিকারের কাজ কতোখানি সোজা হয়ে যায়! আজকালকার শিকারীরাও তো শিকার করতে শেখবার জন্যে জন্তুজানোয়ারের হালচাল কতো ভালো করে জেনে ফেলে! তাহলে, হরিণ-নাচের মধ্যে দিয়ে ওরাও যে এই কাজটিই চালাচ্ছে না তাই বা বলবেন কেমন করে?

আমি বললাম, আরে তাইতো! আর তাই দেখো না, নাচবার সময় ওদের মধ্যে অনেকেই কী রকম ভাবে হরিণ সেজে নাচছে! একেবারে হরিণের ছাল গায়ে দিয়ে, হরিণের মাথা মুখোস হিসেবে পরে, ঠিক হরিণেরই মতো লাফ-ঝাঁপ করে নাচ! তাহলে তো অনায়াসেই ভেবে দেখতে পারা যায় যে

এইভাবে হরিণের ছদ্মবেশ ধরবার মধ্যেও হরিণ শিকারের কায়দা শেখবার চেষ্টা রয়েছে। হরিণের ছদ্মবেশ ধরে শিকার করতে বেরুলে হরিণগুলোকে বোকা বানিয়ে দেওয়া সহজ হবে, সহজ হবে শিকার করবার কাজ।

তাই, ওদের এই নাচ শুধুই নাচ নয়। শিকারকাজের মহড়াও।

এই সঙ্গে কিন্তু আরো একটু ব্যাপার আছে। সে-ব্যাপারটা বুঝতে পারা আমাদের পক্ষে যেন বেশ কঠিন। কেননা, আমাদের সঙ্গে ওদের মন-মেজাজের অনেক তফাত; তাই ওরা যা ভাবছে তা আমরা খুব চটপট ঠাহর করবো কেমন করে? তবু এসো চেষ্টা করা যাক।

ইন্দ্রজাল

এ-দেশ থেকে ও-দেশ, এ-কোম থেকে ও-কোম—আমরা ঘুরতে শুরু করলাম। আর দেখতে লাগলাম ওদের নাচ—তালে তালে, দল বেঁধে, একসঙ্গে নাচ।

কী আশ্চর্য সুন্দর এই নাচ! কিন্তু এ-নাচের আরো গভীর অর্থ রয়েছে।

কেননা আমরা দেখবো, ওরা শিকারে বেরুবার আগে দল বেঁধে তালে তালে নাচছে। নাচটার ভাব কিন্তু এমনই যে শিকার করা বুঝি শেষ হয়েছে, জুটেছে আশ্চর্য শিকার, সার্থক হয়েছে

অভিযান। সবাই মিলে দল বেঁধে নাচছে আর সবাই মিলে দল বেঁধে একসঙ্গে ওই কথা ভাবছে। ভাবছে, শিকার-কাজ সেরে আসা গিয়েছে। ভাবছে, শিকার জুটেছে মনের মতো! তারপর, এই নাচের পর, ওরা বেরুবে শিকারে।

ব্যাপারটা, আমাদের কাছে কী রকম যেন অদ্ভুত মনে হলো। কেননা, আমরা তো আর এ-রকম করবো না। একটা কিছু পেয়ে যাবার পর আমরা আনন্দে নাচতে পারি, কিন্তু একটা কিছু খুঁজতে বেরুবার বা পাবার চেষ্টা করবার আগেই নাচ কেন? যেমন ধরো, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েছি শুনে আমরা আনন্দে নেচে উঠতে পারি। কিন্তু পরীক্ষা দিতে বেরুবার আগেই ভালো নম্বর পাবার কল্পনা করে আমরা কি একবার আনন্দে নেচে উঠি? নিশ্চয়ই তা নয়। ওদের বেলায় কিন্তু ঠিক এর উলটো ব্যাপার। যারা শিকারের ওপর নির্ভর করে বাঁচে তাদের কাছে শিকারই তো সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। অথচ, এই পরীক্ষায় বেরুবার আগেই নাচ, আর নাচের রকম-সকমটা এমনই যে পরীক্ষায় যেন সফল হওয়া গিয়েছে, জুটেছে আশ্চর্য শিকার!

আর শুধু শিকারের ব্যাপারই বা কেন? যারা সবে চাষ-বাস করতে শিখেছে তাদের হালচালও এই রকমের। খেতে বীজ পুঁততে যাবার আগেই দল বেঁধে এমন ঢঙে নাচতে শুরু করলো যে ফসল বুঝি পাওয়া গিয়েছে একেবারে মনের মতো। সব ব্যাপারই এই রকম।

ধরো, বৃষ্টি পড়ছে না। বৃষ্টি না পড়লে জান বাঁচবে না।

বৃষ্টি চাই। বৃষ্টি চাই। ওরা করবে কী? দল-বেঁধে তালে তালে নাচতে শুরু করবে—আর এই নাচের মধ্যেই আকাশের দিকে জলের ছিটে ছড়িয়ে বৃষ্টির একটা নকল তোলবার চেষ্টা করবে।

তুমি ওদের শুধোলে, ব্যাপারটা কী? এরকম ভাবে নেচে লাভটা কী হচ্ছে?

ওরা সত্যিই অবাক হয়ে যাবে। বলবে, বুঝতে পারছো না? এ-নইলে বাঁচবো কেমন করে?

তুমিও নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে! তার মানে? মানেটা বুঝতে হলে ওদের মনে যে-ধরনের বিশ্বাস সেইটার কথা আগে বুঝতে হবে। সে-বিশ্বাসের প্রকাশ হলো ইন্দ্রজাল।

ইন্দ্রজাল মানে কী?

সোজা কথায়, পৃথিবীকে আসলে যতোখানি জয় করা যাচ্ছে না তা কল্পনায় জয় করে পূরণ করে নেবার চেষ্টা। কথাটা একটু ফলাও করে বলি।

পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ—এই যুদ্ধে মানুষ পৃথিবীকে যতোখানি জয় করতে পারছে ততোখানিই তার সম্পদ। কিন্তু পৃথিবীকে বেশি করে, ভালো করে, জয় করবার জন্যে দরকার হলো বেশি ভালো হাতিয়ার। হাতিয়ার যতো উন্নত, যতো ভালো, পৃথিবীকে ততো বেশি করে, ততো ভালো করে, জয় করা সম্ভব। আজকের দিনে দেখো না—আমরা উড়োজাহাজ বানিয়ে জয় করেছি আকাশ, আমরা ডুবোজাহাজ বানিয়ে জয় করেছি পাতাল। বিরাট বিরাট কারখানা, দিগন্তছোঁয়া খেত,

—আমাদের সম্পদ কতোখানি হয়ে উঠেছে! তার আসল কারণ হলো, আমাদের আজকের দিনের যে-সব হাতিয়ার তা দারুণ ভালো, দারুণ উন্নত। কিন্তু আদিম মানুষের বেলায় তো আর তা নয়। তার হাতিয়ার নেহাতই যে বাজে ধরনের। তাই পৃথিবীকে জয় করবার কাজেও সে পড়ে রয়েছে দারুণ পিছিয়ে। পৃথিবীকে কতোটুকুই বা জয় করতে পারছে সে? তাই পৃথিবীকে আসল-জয় করবার ব্যাপারে যে-অভাব সেই অভাব পূরণ করে নেবার চেষ্টা কল্পনায় জয় করা দিয়ে। এই হলো ওদের ইন্দ্রজাল। আকাশে জল নেই, আকাশে জল চাই। কেমন করে তা করা যায়? বৃষ্টির নকল তোলো—সবাই মিলে একসঙ্গে তালে তালে নাচো। তার মানে, তোমরা দল বেঁধে একসঙ্গে যে-কাজ করবে পৃথিবী তা মানতে বাধ্য হবে। তোমরা যদি দল বেঁধে একসঙ্গে শিকার-নাচ নাচো আর যদি সেই নাচের কথাটা এই হয় যে শিকার জুটেছে মনের মতো—তাহলে শিকার জুটবেই জুটবে। তোমরা যদি দল বেঁধে এক সঙ্গে নাচো আর সেই নাচের কথাটা যদি এই হয় যে ফসল ফলেছে মনের মতো —তাহলে ফসল ফলবেই ফলবে। তাই, শিকারে বেরুবার আগেই শিকার-নাচ; শিকার সেরে ফিরে আসবার পর নয়। তাই বীজ পোঁতবার আগেই ফসল-নাচ; মনের মতো ফসল পাবার পরে নয়।

এই হলো ওদের মনের বিশ্বাস, আর এই বিশ্বাসের ওপর ভর দিয়ে ওরা যা করছে তারই নাম হলো ইন্দ্রজাল।

তুমি বলবে, তাও কি কখনো সম্ভব? আমি যদি কল্পনায়

পৃথিবীকে জয় করবার কথা ভাবি তাহলেই কি পৃথিবীকে সত্যিকারের জয় করা হবে? কিংবা, সত্যিকারের জয় করবার ব্যাপারে যেটা অভাব সেটার পূরণ হয়ে যাবে আমার ওই কল্পনায় জয় করা দিয়ে?

আমি বলবো, তুমি যদি এই রকমের কথা ভাবো বা এই রকমের কাজ করো তাহলে তা হবে না। কিন্তু ওরা যখন ভাবতো তখন সত্যিই এ-ব্যাপার অনেকখানি সম্ভবপর হতো। তার মানে, ওদের ওই কল্পনায় পৃথিবী জয় করবার চেষ্টা পৃথিবীকে আসলে জয় করবার কাজকে অনেকখানিই সাহায্য করতো। কিন্তু তোমার-আমার বেলায় তা হবে না।

তার মানে?

মানে ওদের জীবনে একটা ব্যাপার রয়েছে যা কিনা আমরা হারিয়েছি বহুদিন আগে।

কী সেই আশ্চর্য জিনিস যা কিনা আমরা হারিয়েছি আর যার জোরে ওদের জীবনে এই অসম্ভবও যেন সম্ভব হয়?

সেটা হলো, ওই দলের জীবন। আমরা সবাই যেন একা মানুষ, শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমি-আমি তুমি-তুমি ভাব আমাদের জীবনে। ওদের বেলায় কিন্তু একেবারে অন্য রকম। দলটাই আসল। দলটাই সব। পুরো দলের জীবন ছাড়া নিজের জীবন বলতে সত্যিই কিছু নেই। আর এই কথাটি মনে রেখে একবার ভেবে দেখো, ওদের ওই ইন্দ্রজালের ব্যাপার। দল বেঁধে সবাই একসঙ্গে নাচছে আর একসঙ্গে সবাই মিলে একই কথা ভাবছে। হয়তো ভাবছে, শিকার

জুটেছে মনের মতো—দল বেঁধে সবাই মিলে তালে তালে নাচছে আর এই কথাটা ভাবছে। সকলের সামনেই কামনা সফল হবার ছবি। একই ছবি ভুলছে সবাইকার চোখের সামনে। শিকার! ফসল!

আর এই অবস্থায় ওরা যখন সবাই মিলে সাহসে বুক বেঁধে বেরিয়ে পড়লো, বেরিয়ে পড়লো শিকারের সন্ধানে, কিংবা ফসলের আশায়, তখন সত্যিকারের শিকার পাওয়া কিংবা সত্যিকারের ফসল পাওয়া ওদের পক্ষে অনেকখানিই সহজ আর সম্ভব হয়ে পড়বে না কি? পুরো দলটার কল্পনা প্রেরণা যোগাচ্ছে প্রতিজনকে, প্রত্যেকের চোখের সামনেই এক ছবি—কামনা সফল হবার ছবি!

আমাদের পক্ষে আজ এইরকম ভাবে কল্পনায় নির্ভর করবার দরকার পড়ে না। আমরা যে আজ সত্যিকারের জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে পারি। সেই জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কথা ওরা জানতো না। জানবার কথাও নয়। ওরা তাই নির্ভর করতো কল্পনার ওপরেই। এই হলো ওদের ইন্দ্রজাল। আমাদের চোখে আজ ওই ইন্দ্রজাল নেহাতই যেন ছেলেমানুষি ব্যাপার,—নেহাত ভুল, নেহাত ফাঁকি, নেহাত মিথ্যে। তবু এই ভুল, এই ফাঁকি, এই মিথ্যেও ওদের জীবনকে কতোখানি সাহায্য করেছে! দিয়েছে সত্যিকারের শক্তি, সত্যিকারের প্রেরণা!

এইবার এসো, আদিম মানুষদের আস্তানায় যে-সব ছবি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে সেই ছবিগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে

নেওয়া যাক। ওরা ওই সব ছবি আঁকতো কেন? তার কারণও ইন্দ্রজালই। ছবিগুলো ভালো করে দেখো—শিকার যেন সার্থক হয়েছে তারই ছবি। তাই, ওদের নাচ আর ওদের ছবি দুয়ের মূলেই এক বিশ্বাস! ওই ইন্দ্রজাল।

ছবি দেখিয়ে লোকের মন ভোলাবার চেষ্টা মোটেই নয়। তাই দেখো না, একটা ছবি এঁকে আবার তারই গায়ের ওপরে আর একটা ছবি এঁকেছে। কাজের তাগিদে এঁকেছে, বাঁচবার তাগিদে এঁকেছে,—পাঁচজনকে ডেকে দেখাবার তাগিদে তো আঁকেনি।

তবু কী আশ্চর্য সব ছবি! দেখতে দেখতে মন যেন ভরে যায়, চোখ যেন আর সরতে চায় না!



যুগের পর যুগ



আদিম যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের সভ্যতা আর সংস্কৃতির কাহিনী। এক একটি বইতে এক এক যুগের কথা। এমন সহজ আর ঘরোয়া ভাবে লেখা যে পড়লে মনে হবে বুঝি গল্পই। অথচ, পুরো সিরিজ পড়া হলে শুধু ছোটোরা কেন বড়োরাও পৃথিবীর সংস্কৃতির একটা আগাগোড়া আর ধারাবাহিক খবর পাবেন।

প্রথম বই "মানুষ তখন কী ছেলেমানুষ"। এতে আদিম মানুষের কথা—তারা বাঁচতো কেমন করে? ভাবতো কি? করতো কী? কেন নাচতো? কেন আঁকতো? আর জানোয়ারের নাম থেকেই বা নিজেদের দলের নামকরণ করতো কেন? এই সব কথা। পড়তে যতোই মজা লাগুক না কেন, কঠিন লাগবে না একটুও।



যুগের পর যুগ

